পশ্চিমবঙ্গে প্রথম
'Demarcation Theory' applied
Demarcated
ভূগোল ও বিজ্ঞান
সহায়িকা
পশ্চিমবঙ্গে প্রথম
Demarcation Theory
applied
সবার বই
Class
6 to 10
উলটে দেখুন, তফাতটা চোখে পড়বে।
GUARANTEED

আনন্দমেলা

৪১ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ২০ জানুয়ারি ২০১৬ ৫ মাঘ ১৪২২

সূচিপত্র

আনন্দমেলা এবার ওয়েবসাইটে: www.anandamela.in

প্রচ্ছদ: কুনাল বর্মণ

সম্পাদক: পৌলোমী সেনগুপ্ত

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিমিটেড ২১১/২০৭ উপেন ব্যানার্জি রোড কলকাতা ৭০০ ০৬০ থেকে মুদ্রিত। বিমান মাশুল: আন্দামান, মণিপুর এক টাকা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনও দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

দস্যি ডেনিস
জীবনের কী ঝক্কি!
মিঃ উইলসন, আপনি কেন চিরকাল এই একভাবেই বসে থাকেন?
তোমাকে গুছিয়ে বলছি একটা সময় কী ঘোরাঘুরিটাই না করেছি!
জান ডেনিস, উনি একজন ডাকবাহক, মানে, পিওন ছিলেন।
তাই নাকি? পিওন হওয়া কি শক্ত কাজ?
অবশ্যই, তা আর বলতে।
প্রত্যেকদিন বাড়ি-বাড়ি কত চিঠিচাপাটি পৌঁছনো...ঝড়বিদ্যুৎ, রোদ-বৃষ্টি, তুষারপাত সব কিছু উপেক্ষা করে।
বাব্বা!
হুম...একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না তো জর্জ?
চিঠি পৌঁছতে যখন, আপনাকে কি অফিস থেকে একটা গাড়িও দিত না?
আজ্ঞে না মশাই!
আমরা পায়ে হেঁটেই চিঠি বিলি করতাম, আর মুখে হাসিও কিন্তু থাকত সব সময়।
হুম, এখন বুঝতে পেরেছি আপনি কেন এত গোমড়ামুখো হয়ে গিয়েছেন আর কোথাও যেতে চান না।
কেননা আপনার কাজ শেষ!

খুদে প্রতিভা

আবার একটা নতুন বছর শুরু হল। এই নতুন বছরে তোমরা কে কী প্রতিজ্ঞা করলে? লেখা প্রতিযোগিতার ফলাফল।

প্রথম

নতুন বছরে সবাই কিছু না-কিছু প্রতিজ্ঞা করে এবং চেষ্টা করে সে প্রতিজ্ঞা পূরণ করার। আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু মেঘাই আমাকে বলেছে নতুন বছরে কিছু ভাল প্রতিজ্ঞা করতে হয়। আমার প্রতিজ্ঞাটা একটু অন্য রকম। যেদিন ছুটির পর আমি একঘণ্টা ক্লাসে আটকে থাকার শাস্তি পেয়েছিলাম, সেইদিন প্রতিজ্ঞা করেছি যে আশপাশে প্রকৃতির সব বন্দিকে আমি মুক্ত করে দেব। আমার পাখি পোষার খুব ইচ্ছে ছিল। তাই ছাদের ঘরে একটা খাঁচায় নানান রঙের পাখি পোষা ছিল আর দাঁড়ের উপর বাঁধা ছিল একটা ধপধপে সাদা কাকাতুয়া। আমি সব পাখিকে উড়িয়ে দিয়েছি। আমার প্রতিজ্ঞা পালন তো আমাকে দিয়েই শুরু করা উচিত। কিছুদিন আগে যখন আমার বন্ধু তুলির বাড়ি গিয়েছিলাম, ওদের খরগোশের খাঁচাটা তো আমিই টুক করে খুলে দিয়েছিলাম। অনুপিসির প্রজাপতিগুলোও আমিই বাগানে ছেড়ে দিয়েছি। এছাড়া তাতানদের কুকুর, পাশের বাড়ির নতুন কেনা টিয়াপাখি সবাই বোধ হয় ছাড়া পেয়ে খুব খুশি। ওদের মুক্তি দিয়ে খুশি আমিও। তবে আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে হচ্ছে লুকিয়ে-লুকিয়ে, না হলে কী যে হবে...কে জানে! তবে এই প্রতিজ্ঞার কথা আমি মেঘাকেও বলিনি। কেন? ওর কাছেই তো তিনটে বদরি পাখি আছে। সামনের মাসে ওর জন্মদিনের অপেক্ষা। সেইদিনই বদরিগুলোর মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে, তোমরা আবার ওকে বলে দিও না যেন...

মনস্বিতা পালচৌধুরী
অষ্টম শ্রেণি,
মজিলপুর শ্যামসুন্দর বালিকা বিদ্যালয়, জয়নগর।

দ্বিতীয়

প্রত্যেকের কাছে নতুন বছর যেমন একটা নতুন উৎসবের সমতুল্য, তেমনই আমার কাছেও। সত্যি কথা বলতে কী, বার্ষিক পরীক্ষার রেজ়াল্ট বেরবার পরে জানতে পারলাম যে, ক্লাসে আমি প্রথম হয়েছি, কিন্তু ইতিহাসে পনেরো নম্বর কম পেয়েছি। তারপর থেকে নিরালায় যতবার বসি, ততবারই মনে পড়ে এই কথা। অজান্তেই চোখ দিয়ে অশ্রুধারা অঝোরে ঝরতে থাকে। তাই আমি নতুন প্রতিজ্ঞায় অঙ্গীকার বদ্ধ হয়েছি। সেটা হল, এই আগামী ২০১৬ সাল অর্থাৎ যাকে আমি নতুন বছর দিয়ে সম্বোধন করছি, সেই বছরে আমি যেন বার্ষিক পরীক্ষায় ইতিহাসে ভাল নম্বর তুলতে পারি। তা ছাড়াও এই বর্তমান বছরে আমি যুব উৎসবে কুইজ়ে প্রথম হয়েছি এবং অর্জুনসমগ্র ৩-সমরেশ মজুমদার প্রণীত বইটি পুরস্কার পেয়েছি, যা আমি পরবর্তী বাঁকুড়া বইমেলায় কিনব বলে ঠিক করেছিলাম। ২০১৬ সালে আরও একটা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি যার দ্বারা আমি যেন পরে অর্থাৎ ২০১৬ সালে আবার কুইজ়ে প্রথম স্থান অধিকার করতে পারি। এই দুই প্রতিজ্ঞায় অনড় থেকে যদি আমি নতুন বছরে সফল হই, তা হলে ভাবব যে নতুন বছরের আমার হিসেবের খাতা সার্থক হয়ে উঠল।

অতীন দে
অষ্টম শ্রেণি, রাজখামার উচ্চ বিদ্যালয়, বাঁকুড়া।

তৃতীয়

নতুন বছরের আগের দিন টিভিতে দেখলাম পরিবেশ দূষণের সেইসব কারণ ও তার ভয়ঙ্কর ফলাফল। ভাবলাম বড় কিছু করতে পারলেও আমার তরফ থেকে কিছু করব নতুন বছরে। তা ছাড়া নানা জিনিসের অপব্যবহার ও অকারণে ব্যবহার করব না। তারপর এইসব ভাবতে-ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে খেলার জন্য মাঠে গেলাম। দেখলাম আমার এক বন্ধু চিপ্‌স খেতে-খেতে মাঠের পাশেই ফেলেছিল। আমি সেটাকে নিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিলাম। ফেরার পথে রাস্তার ধারে দেখি নলকূপের জল খোলা রয়েছে। আমি নলকূপটিকে বন্ধ করে দিলাম যাতে জল পড়ে নষ্ট না হয়। এইসব কাজ করে আমার নিজেরও ভাল লাগল। তাই আমি নতুন বছরে প্রতিজ্ঞা করলাম যে আমি আর বিভিন্ন জিনিসের অপব্যবহার বা অকারণে ব্যবহার করে নষ্ট করব না ও অন্যকেও করতে দেব না।

রৌণক ভট্টাচার্য
অষ্টম শ্রেণি, বেড়াচাঁপা দেউলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগনা।

আমি কাগজ ছিঁড়ে বাড়িঘর নোংরা করি। স্বচ্ছ ভারত গড়তে আমি এই নতুন বছরে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আর কাগজ ছিঁড়ে বাড়িঘর নোংরা করব না। কাগজ তৈরি হয় গাছ কেটে। কাগজ নষ্ট করলে পরিবেশে গাছের সংখ্যা কমে যাবে এবং পরিবেশ দূষণও বাড়বে। বাড়িতে আমার কোনও খেলার সাথী নেই। আমি কিছু পুষতে চাই। মা আমাকে কিছু পুষতে দেন না। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, বাড়িতে ফুলের বাগান বানাব। ফুলের মধু খেতে অনেক প্রজাপতি আসবে। তা হলে ফুলের বাগান ও প্রজাপতি আমার খেলার সঙ্গী হবে। এভাবে পরিবেশদূষণ হবে না এবং আমি খেলার সঙ্গীও পাব।

নিসর্গ অধিকারী
চতুর্থ শ্রেণি, সারদা শিশুমন্দির, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

একটা নতুন বছর শুরু হল। এই নতুন বছরে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম দীপাবলীতে আর বেশি পটকা ফাটাব না। কারণ, ওইসব বারুদের ধোঁয়া বায়ুদূষণ সৃষ্টি করে।
লেবু, চকোলেট বা চিপ্‌স খেয়ে বাইরে ফেলব না।
টুয়ে অ্যানুয়াল পরীক্ষায় থার্ড হয়েছি, ফার্স্ট হতে পারিনি। তাই প্রচুর পড়ে ফার্স্ট হবই হব।
আমি স্কুলের ক্লাসে চেঁচামিচি, গল্পগুজব করব না এবং শান্ত হয়ে বসে থাকব।
খারাপ ছেলেদের সঙ্গে কখনও মিশব না।
টিভি, মোবাইল, ট্যাব, ল্যাপটপ দেখা কমিয়ে দেব।

পুরয়িতা পাল
তৃতীয় শ্রেণি, গুলুড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ শিশুশিক্ষা নিকেতন, পূর্ব মেদিনীপুর।

আরও যারা ভাল লিখেছে

পারমিতা শীল
অষ্টম শ্রেণি, মধ্যমগ্রাম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগনা।

সুপ্রাণা চক্রবর্তী
ষষ্ঠ শ্রেণি, ভোর আকাদেমি, জলপাইগুড়ি।

তিয়াস মজুমদার
অষ্টম শ্রেণি, পাঠভবন, কলকাতা।

শুভ্রজ্যোতি শাসমল
ষষ্ঠ শ্রেণি, সাঁত্রাগাছি কেদারনাথ ইনস্টিটিশন, হাওড়া।

অলোকেন্দু চট্টোপাধ্যায়
সপ্তম শ্রেণি, ডি এ ভি পাবলিক স্কুল, বাঁকুড়া।

অদ্রিজা পাল
চতুর্থ শ্রেণি, দিল্লি পাবলিক স্কুল, শিলিগুড়ি।

অর্চন পণ্ডা
পঞ্চম শ্রেণি, মডেল ইনস্টিটিউশন, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর।

জাগৃতি দত্তবণিক
ষষ্ঠ শ্রেণি,নবগ্রাম হীরালাল পাল বালিকা বিদ্যালয়, হুগলি।

শুভ্রদীপ বিশ্বাস
ষষ্ঠ শ্রেণি, শ্রীরামকৃষ্ণ শিশুতীর্থ হাই স্কুল, হুগলি।

এবারের প্রতিযোগিতা

সামনেই আসছে সরস্বতী পুজো। লেখাপড়া তো বটেই, গানবাজনা, খেলাধুলো কোথায় কে কী বর চাও? যারা ক্লাস টু থেকে এইটে পড়ো, তারাই লিখে পাঠাও ১৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম ও ক্লাস জানিও বাংলা আর ইংরেজিতে। সেরা কয়েকটি লেখা আমরা ২০ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় ছাপব। খামের উপর কোন সংখ্যার খুদে প্রতিভা পাঠাচ্ছ, লিখবে এবার থেকে।
ঠিকানা: 'খুদে প্রতিভা', 'আনন্দমেলা', ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১

বিশ্বের বনজঙ্গল

পৃথিবীকে প্রাণ জোগায় যে জঙ্গল, তাকে আমরা কতটুকু চিনি? পৃথিবীর বিভিন্ন জঙ্গল নিয়ে নানা কথা লিখেছেন **ধৃতিমান গঙ্গোপাধ্যায়**

পাখির চোখে আমাজন

স্কুলের সিলেবাসের কল্যাণে এতদিনে সবাই জেনে গিয়েছি, আমাদের জীবনে বনজঙ্গলের প্রভাব কতখানি। পৃথিবীতে মানুষের জন্মের সেই প্রথমদিন থেকে, তার জীবনধারণের সবকিছু জুগিয়ে চলেছে জঙ্গলই। খাবারই বলো, বাসস্থানই বলো, পোশাকই বলো আর ওষুধপত্রই বলো, সবেরই সোর্স তো ওই জঙ্গলই! সবচেয়ে বড় কথা, অক্সিজেনের সবচেয়ে বড় সোর্সও এই জঙ্গলই। জঙ্গলের হাজার গুণাগুণ নিয়ে আরও কথা বলতে গেলে এই লেখাটা ওই নিয়েই হবে। সেটা তো উদ্দেশ্য নয়। মোদ্দা ব্যাপার হল, মানুষ

যত সভ্য হয়েছে, তত তার প্রয়োজন বেড়েছে। সে বাড়ি বানিয়েছে, চাষ করেছে। বনজঙ্গল কেটে সাফ করে ফেলেছে। জঙ্গল পিছিয়ে যেতে-যেতে অবস্থা এখন এমনই যে, সমস্ত পৃথিবীটাই হাঁসফাঁস করছে। বুঝতেই পারছ, পৃথিবীর জঙ্গলগুলোকে, আমাদের জঙ্গুলে পৃথিবীটাকে চিনে নেওয়া খুব দরকার। না হলে বড় হয়ে জঙ্গলের ক্ষতি হওয়া আটকাব কেমন করে? আর কোন জঙ্গল থেকে কী উপকার পেতে পারি, সেটা জানাও তো জরুরি।

এবার ব্যাপার হল, ভৌগোলিক এবং পরিবেশবিদরা মিলে প্রায় ২৬ ধরনের জঙ্গলের কথা বলেছেন। এত রকম জঙ্গল বোঝাতে গেলে একটা এনসাইক্লোপিডিয়ার দরকার হয়, বিকল্প, বায়োম (যে ভৌগোলিক বিভাগে একটি বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ এবং জীবজন্তুর দেখা পাওয়া যায়) ধরে-ধরে এগোনো। মুশকিল হল, সবই তো আর জঙ্গল নয়। এই লেখায় তাই চেষ্টা করব, মোটামুটিভাবে মহাদেশ ধরে-ধরে একটা জঙ্গুলে ম্যাপ তৈরি করার। এসো, লেগে পড়া যাক...

দক্ষিণ আমেরিকার আমাজ়ন

আমাজ়ন নদীটি সাড়ে ছ'হাজার কিলোমিটার লম্বা, এর অববাহিকা তৈরি হয়েছে আটটি দক্ষিণ আমেরিকান দেশের উপরে। পৃথিবীর দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী (আমাজ়ন প্রায় ছ'হাজার কিলোমিটার, নীল নদের চেয়ে প্রায় চারশো কিমি কম) হলেও, জলের পরিমাণে আমাজ়নের ধারেকাছেও কোনও নদী আসে না। গ্রীষ্মকালেই, প্রতিদিন ৭৭৬ বিলিয়ন গ্যালন জল বহন করে নিয়ে যায় আমাজ়ন! নীল নদ সেখানে মাত্র ৮০ বিলিয়ন! এসব ছেড়ে, এবার দেখব এই নদীর কোল ঘেঁষে যে জঙ্গল জন্মেছে, তার দিকে। মহাদেশটির ৪০% অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছে এই জঙ্গল। পৃথিবীর প্রাচীনতম রেনফরেস্ট বা বৃষ্টিঅরণ্যগুলোর মধ্যে আমাজ়ন অন্যতম। সবচেয়ে বড়, ঘন, সবচেয়ে রহস্যময়ও বটে। কতখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে এই জঙ্গল? প্রায় ৫৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার! আর আমাজ়ন বায়োমের আয়তন ৬৭ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার, যা কিনা আমাদের দেশের আয়তনের প্রায় দ্বিগুণ! ভাবা যায়? এর মধ্যে বেশির ভাগ জঙ্গুলে অঞ্চলই ব্রাজ়িলে। অনেক দূরের দ্বিতীয় স্থানটি পেরুর। আমাজ়নের জঙ্গলকে 'পৃথিবীর ফুসফুস' আখ্যা দেওয়াই যায়। বিজ্ঞানীদের মতে, আমাজ়ন যতদিন আছে, পৃথিবীও ততদিনই ভাল থাকবে। আচ্ছা, আগে বলে নিই, বৃষ্টিঅরণ্য ব্যাপারটা ঠিক কী। বিষুবরেখার কাছাকাছি অঞ্চলে আমরা পাই ক্রান্তীয় বৃষ্টিঅরণ্য। ভূগোল বইয়েই পাবে, সূর্যের সবচেয়ে 'আদরের' জায়গা এই বিষুবরেখা। ২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নীচে কখনওই নামে না তাপমাত্রা, বৃষ্টিও হয় প্রচুর। ফলে এই অঞ্চলেই বনজঙ্গলের বেড়ে ওঠার সুযোগ সবচেয়ে বেশি। যে-কোনও ঘন বৃষ্টিঅরণ্যে ঢুকলেই দেখা যায়, খুব লম্বা-লম্বা গাছ প্রচুর পাতা মেলে সূর্যকে প্রায় ঢেকেই দিয়েছে। লম্বা গাছগুলোর আশ্রয়ে আবার অগুন্তি ছোট-ছোট উদ্ভিদ। আমাজ়নের এক-এক জায়গায় জঙ্গল এতটাই ঘন যে, কোনও গাছ যখন বুড়ো হয়ে ভেঙে পড়ে, তা মাটিও ছোঁয় না। জায়গা হয় অন্য গাছের কোলেই। এমনকী, বৃষ্টি পড়লে, পাতার জাল ভেদ করে তা মাটিতে পড়তে সময় লাগে পাক্কা দশ মিনিট!

নানা রঙের ম্যাকাও

● গাছপালা

আমাজ়নের জঙ্গলে নাকি ৮০ হাজারেরও বেশি প্রজাতির গাছপালার দেখা মেলে। এখনও হয়তো অনেক গাছপালার আবিষ্কারই হয়নি। মানুষের পা পড়লে তবে তো পাওয়া যাবে গাছের হদিশ! এই এত প্রজাতির মধ্যে কিন্তু আছে অনেক এমন উদ্ভিদ, যা থেকে তৈরি হয় ওষুধ। বিজ্ঞানীদের মতে, অনেক রকম প্রতিষেধকের রহস্যও লুকিয়ে আছে আমাজ়নে। প্রায় ৩০০ রকমের ক্যান্সার-প্রতিষেধক ওষুধেরও সন্ধান নাকি আছে এই জঙ্গলের গভীরে। মজার কথা হচ্ছে, মাত্র এক শতাংশ উদ্ভিদের উপরেই নাকি পরীক্ষা করা গিয়েছে এখনও পর্যন্ত। ভাবতে পারছ, কী বিশাল সম্পদ লুকিয়ে আছে আমাজ়নে? আমাজ়নে দেখা পাওয়া যায় মুরুমুরু নামের একটি পামের, যা থেকে পাওয়া যায় তেল। এই গাছে নাকি গাজরের তিন গুণ ভিটামিন এ পাওয়া যায়।

আমাজ়নের মানুষ

টিনটিন কমিক্সে আরামবায়াদের কথা মনে আছে? তাদের বাস ছিল আমাজ়নে। ব্লো-গান দিয়ে তারা শত্রুর মোকাবিলা করত। তাদের প্রধান শত্রু ছিল আবার রামবাবাব নামের আর-একটি উপজাতি। এবার বাস্তবে আসি। আমাজ়নের জঙ্গলে নাকি ৪০০ থেকে ৫০০টি উপজাতির বাস। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এর মধ্যে অন্তত ৫০টি উপজাতির সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর কোনও পরিচয়ই হয়নি এখনও।

● জীবজন্তু

জমকালো জন্তুজানোয়ার ছাড়া আবার জঙ্গল কী? আমাজ়ন যখন জঙ্গলের ব্যাপারে ফার্স্ট বয়, জন্তুজানোয়ারের ব্যাপারেও তেমনই তো হবে! ৪২৭ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ১৩০০ প্রজাতির পাখি এবং ৩৭৮ প্রজাতির সরীসৃপের দেখা পাওয়া যায় আমাজ়নে। আমাজ়নের অনেক প্রাণী এমনই যা পৃথিবীতে আর কোথাওই দেখা পাওয়ার কোনও সুযোগ নেই। বিভিন্ন ধরনের ম্যাকাও তাদের রঙে চোখ ঝলসে দেয়, আধ মাইল দূর থেকে শোনা যায় টাউকান নামের এক জাতীয় ধনেশ পাখির ডাক। স্পাইডার মাঙ্কি, উলি মাঙ্কি গাছে-গাছে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। আছে শূকরের মতো দেখতে তৃণভোজী প্রাণী টাপির, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রোডেন্ট ক্যাপিবারা। একটা কথা মনে রাখতে হবে, জন্তুজানোয়ারের দিক দিয়ে আমাজন কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক জঙ্গলও বটে। জলে, ডাঙায়, গাছে সবসময় অপেক্ষা করে আছে শিকারী জন্তুজানোয়ার। সবার প্রথমে বলতে হয় জাগুয়ারের কথা। ইনি পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম 'বিড়াল'! আর শিকারি বিড়ালদের মধ্যে জাগুয়ারের কামড়ের জোরটিই সবচেয়ে বেশি। লেপার্ডের মতো গাছে বেশিক্ষণ থাকে না জাগুয়ার। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, জলে সাঁতার কেটে উঠে শিকার ধরাই তার প্রিয় কাজ। এমনকী, প্রায়ই সাঁতার কেটে পার থেকে কুমিরের (আমাজ়নে যার নাম কাইমান) উপর আক্রমণ করতেও দেখা যায় জাগুয়ারকে। জাগুয়ার যদি স্তন্যপায়ীদের মধ্যে সর্বোচ্চ শিকারি প্রাণী হন, সরীসৃপদের মধ্যে সেই পদ সবুজ অ্যানাকন্ডার। এই সাপটির প্যাঁচে পড়লে কী হতে পারে, তা তো কত ছবিতেই দেখা গিয়েছে! তবে মনে রেখো, অ্যানাকন্ডা শুধু আমাজ়নেই পাওয়া যায় এবং সিনেমায় দেখার মতো অত লম্বাও হয় না। তাই বলে এই সাপকে ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করা যাবে না! ৩০ ফিট লম্বা এই সাপের ওজন ২০০ কেজিরও উপরে। পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী সাপ অ্যানাকন্ডা। হরিণ, শূকর, কুমির, এমনকী, জাগুয়ারেরও নিস্তার নেই তার হাঁ থেকে। জলাজমিতেই দেখা পাওয়া যায় অ্যানাকন্ডাকে। আরও একটু গভীর জলে গেলে, কুমির তো আছেই, নদীর মধ্যে আছে ভয়ঙ্কর পিরানহা মাছ এবং ইলেকট্রিক ইল। জীবন্ত হরিণকে কয়েক মিনিটের মধ্যে খুবলে খেয়ে 'কঙ্কাল' করে দিতে পারে একঝাঁক পিরানহা। পিয়ারাকুর মতো ১৫০ কেজি ওজনের মাছও তো আছে আমাজ়নে! মাংসাশী মাছটির জিভেও আছে দাঁত! এতেই শেষ নয়। আকাশে ওড়া হার্পি ঈগল যদি তোমাকে কিছু না-ও করে, পায়ের দিকে চোখ রেখো। বিষাক্ত

অ্যানাকন্ডার থেকে সাবধান

banglabooks.in

পিট ভাইপার তো আছেই, ব্রাজিলিয়ান ওয়ান্ডারিং স্পাইডার বা বুলেট অ্যান্টের কামড় খেলেও কিন্তু মোটেই সুখকর হবে না ব্যাপারটা। বুলেট অ্যান্টের নামটি কিন্তু এমনি-এমনি অমন নয়। যন্ত্রণাটা ঠিক গুলির আঘাতের মতোই!

মানুষের কাজকর্মের জন্য রোজ পিছিয়ে যাচ্ছে আমাজন। গবাদিপশুর চারণভূমি হিসেবে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে জঙ্গলের অনেকাংশ। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রত্যেক বছর প্রায় ৫০ হাজার উদ্ভিদ বা জীবজন্তু প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বৃষ্টিঅরণ্য থেকে। এরমধ্যে বেশির ভাগেরই জন্ম এবং কর্মস্থল আমাজন।

বিষ

আমাজনেই জন্মায় পয়জন ডার্ট ফ্রগ। নীল, সোনালি, তামাটে, নানা উজ্জ্বল রঙে দেখা পাওয়া যায় এই ব্যাঙেদের। কিন্তু চামড়ার রং যতটা উজ্জ্বল, চামড়াও কিন্তু ততটাই বিপজ্জনক! এই ব্যাঙের চামড়া থেকে নিঃসৃত হতে থাকে অত্যন্ত শক্তিশালী বিষ। একটি সোনালি ডার্ট ফ্রগের চামড়ায় যা বিষ, তাতে দশজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মৃত্যু হতে পারে। কলম্বিয়ার এম্বেরা উপজাতির বড়ই প্রিয় বিষ এইটি! মনে করা হয়, এরা যে পোকামাকড় খায়, তাদের পেটে থাকা বিষই জমা হয় ব্যাঙের শরীরে। আর পোকামাকড়ের শরীরে সে বিষ আসে বিভিন্ন গাছ থেকে, যেগুলো পোকাদের খাদ্য! বুঝতে পারছ, খাদ্য শৃঙ্খলের মহিমা!

আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকা

জঙ্গল বললেই দ্বিতীয় যে জায়গাটির কথা মনে পড়ে, তা আফ্রিকা! 'টারজান'-এর বইয়ের সেই বিখ্যাত কঙ্গো! ঘন জঙ্গল ছড়িয়ে আছে আফ্রিকার ছ'টি দেশ জুড়ে। আয়তন, প্রায় ১৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। পর্যটকরা যখন সবে আবিষ্কার করা শুরু করেছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন দুর্গম প্রান্ত, তখন কঙ্গোর এই জঙ্গলের ভয়েই আফ্রিকাকে তাঁরা নাম দিয়েছিলেন 'অন্ধকার দেশ'। সভ্যতা এগোনোর সঙ্গে-সঙ্গে আফ্রিকার এই বিশাল জঙ্গল কিন্তু ধীরে-ধীরে পিছনে সরে যাচ্ছে!

• গাছপালা

শুরু করা যাক বৃষ্টিঅরণ্য দিয়ে। আমাজন নিয়ে লেখার সময়ই আমরা দেখলাম কতটা ঘন হয় বৃষ্টিঅরণ্য। আফ্রিকাও কম যায় না। সেখানেও আছে প্রায় ১০ হাজার প্রজাতির গাছপালা। এর মধ্যে যেমন আছে মেহগনি বা কাপোকের মতো বিরাট উঁচু-উঁচু গাছ, তেমনই আছে অগুন্তি ছোট উদ্ভিদও। এক গাছ থেকে অন্য গাছে টারজানের সেই লতা ঝুলে-ঝুলে যাওয়া মনে পড়ে? আসলে আফ্রিকার বৃষ্টিঅরণ্যে জন্মায় প্রায় ২৫০০ লতাগাছ। বৃষ্টিঅরণ্যের গাছগুলোর পাতাতেও থাকে মজার ছোঁয়া। জল ধরার

জন্য, মগডালের পাতায় থাকে এক ধরনের মোম। এর থেকে নীচে যে পাতা, সেগুলো বড় এবং গোল, যাতে সূর্যের আলো ছুঁতে পারে। আর মাটির কাছাকাছি? সেখানে ঘন জঙ্গল, আলো মোটেই পৌঁছয় না। আর রেনফরেস্ট ছাড়িয়ে যদি একটু এগোই? 'চাঁদের পাহাড়'-এ শঙ্করের অবস্থা মনে আছে? বৃষ্টিঅরণ্য অঞ্চল পেরলেই এসে পড়ব আফ্রিকার কুখ্যাত সাভানায়। কোমর-সমান উঁচু এলিফ্যান্ট ঘাস এবং বারমুডা ঘাসের বিস্তৃত জমি। ইতিউতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মোটা বাওবাব বা মানকেট্টি গাছ। আর এই ঘাসের জঙ্গলেই যাবতীয় ভয়...কেন?

● জীবজন্তু

একটা কথা পরিষ্কার করে দিই। টারজ়ানের গল্পে যেমন একই জায়গায় ছিল গোরিলা এবং সিংহের সহাবস্থান, তা কিন্তু আদতে মোটেই হয় না। গোরিলাদের দু'টি প্রজাতি, ওয়েস্টার্ন গোরিলা এবং মাউন্টেন গোরিলা, থাকে বৃষ্টিঅরণ্য অঞ্চলেই। দল বেঁধে রাজত্ব করে বেড়ায়। বড়-বড় গাছে নিজেদের জাহির করে বেড়ায় শিম্পাঞ্জি, বোনোবো, কলোবাস বাঁদর। হাতিও (এই প্রজাতির নাম ফরেস্ট এলিফ্যান্ট) বসবাস করে এই বৃষ্টিঅরণ্যে। মন ভরল না, তাই না? আহা, অনেক সাপখোপও তো আছেই। প্রচণ্ড বিষাক্ত ভাইপার থেকে শুরু করে আফ্রিকান রক পাইথন...তবু যেন কী-একটা মিসিং, না?

বাচ্চা কোলে শিম্পাঞ্জি

আসলে, আফ্রিকার বিখ্যাত জন্তুজানোয়ারগুলো, অর্থাৎ, সিংহ, লেপার্ড, চিতা, সবারই কিন্তু বাস ঘাসজমিতেই, সাহারা মরুভূমি আর বৃষ্টিঅরণ্যের মাঝামাঝি অঞ্চলে। বেশি বড় প্রজাতির হাতি, যাকে আফ্রিকান এলিফ্যান্ট বলে, তিনিও আছেন সাভানাতেই। এই ঘাসজমিতেই ভ্রমণ করে বেড়ায় জ়েব্রা, জিরাফ, মোষ, উইল্ডারবিস্ট, আর ঘাসজমিতেই, নিজেদের লুকিয়ে এই তৃণভোজীদের শিকার করার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন স্বয়ং পশুরাজ। গাছের উপর অপেক্ষা করে থাকে লেপার্ড। চিতা অপেক্ষা করে থাকে নিজের স্প্রিন্ট শুরু করার জন্য! চমকাচ্ছ না তো? লেপার্ড, চিতা আলাদা নাকি?

শক্তিশালী

আফ্রিকার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণীটির নাম কী বলো তো? হাতি? উঁহু। গুবরে পোকা! ইংরেজিতে বললে, ডাং বিট্‌ল। নিজের ওজনের ৫০ গুণ ওজনের গোবরের তাল গড়িয়ে-গড়িয়ে বহু দূর-দূর জায়গায় নিয়ে যায় এই পোকা। খাদ্য? ওই গোবরই! রাস্তা আটকানোর চেষ্টা করো, কিছুতেই সে থামবে না!

বাংলায় আমরা সব চাকা-চাকা দাগওয়ালা বাঘকেই 'চিতাবাঘ' বললেও, জাগুয়ার, লেপার্ড বা চিতা সম্পূর্ণ আলাদা প্রাণী। জাগুয়ারকে আমরা ছেড়ে এসেছি

ঘুম-অসুখ

আফ্রিকার একটি পোকার নাম সেৎসি ফ্লাই। এই পোকাটির কামড়ে হয় 'স্লিপিং সিকনেস'। এই অসুখের নাম কেন এরকম? আসলে, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে আক্রমণ করে, ব্রেনের সমস্ত ঘেঁটে দেয় এই অসুখ। ফলে, রোগী সারাদিন ঘুমোয়, সারারাত জেগে থাকে!

আমাজ়নে, আফ্রিকার লেপার্ড শক্তিশালী এবং খুব গেছো। সাধারণত গাছের উপর থেকে লাফ দিয়েই সে শিকার ধরে। আর চিতা? তার জন্য দুঃখই হয়। সে পৃথিবীর সবচেয়ে গতিময় স্তন্যপায়ী। প্রাণপণ ছুটে গেজ়েল ধরে, কিন্তু এতটাই দুর্বল সে, যে প্রায়ই শিকার করার পরও তার শিকার নিয়ে চলে যায় হায়েনা, এমনকী সিংহও! আফ্রিকার বিখ্যাত দুইশৃঙ্গ গন্ডারও ঘুরে বেড়ায় এই সাভানাতেই। জলে আছে জলহস্তী এবং বিপজ্জনক কুমির। আফ্রিকার কুখ্যাত, প্রচণ্ড বিষাক্ত ব্ল্যাক মাম্বাও এই ঘাসজমিতেই বসবাস করে। তবে আফ্রিকায় বেড়াতে গেলে কিন্তু সবচেয়ে বেশি সাবধান থাকতে হবে...উঁহু, সিংহ, চিতা বা হাতির থেকে নয়। আফ্রিকার সবচেয়ে বিপজ্জনক পশুর নাম কেপ বাফেলো। বিশাল আয়তনের মোষটির মেজাজ বড়ই চড়া। কখন যে মেজাজ হারিয়ে গুঁতিয়ে বসে! সাধে কি সিংহও ডরায় এই মোষকে?

এশিয়া

এশিয়ার জঙ্গল বলতে আবারও বৃষ্টিঅরণ্যের কথাই আমরা বলব। সে-জঙ্গল ধারে ও ভারে আমাজ়ন বা কঙ্গো বেসিনের মতো না হলেও, বোর্নিও বা সুমাত্রার জঙ্গল কিন্তু প্রাণসম্ভারে টইটম্বুর। বহু অল্পচেনা প্রাণীর বসবাস এই জঙ্গলে। শুধু ইন্দোনেশিয়া দেশটাতেই পৃথিবীর তিন শতাংশ জঙ্গল আছে। এবং, এই জঙ্গল পৃথিবীর আদিমতম জঙ্গল। জন্মকাল, আজ থেকে সাত কোটি বছর আগে। আর, ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের দেশেরও অনেকখানি জুড়ে আছে এই জঙ্গল। আন্দামান থেকে শুরু করে, পশ্চিম ঘাট পর্বতমালার ঘন জঙ্গল, এদিকে অসম এবং ওড়িশা, ঘন বৃষ্টিঅরণ্য ভারতে কম কোথায়?

• গাছপালা

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার এই আদিম জঙ্গলের মধ্যে, শুধু বোর্নিওতেই দেখা পাওয়া যায় ১৫ হাজার প্রজাতির গাছের। এর মধ্যে আছে আমাদের বেশ কিছু চেনা গাছও। শাল, বট, বাঁশ এই জঙ্গলে একে অন্যকে ভালবেসে জড়াজড়ি করে আছে। আছে

সুন্দরবন

এশিয়া তথা ভারতের জঙ্গলের কথা বলা হবে, আর বাদ পড়বে সুন্দরবন? তা কি হয়? পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ জঙ্গল ছড়িয়ে আছে দশ হাজার বর্গকিলোমিটার জুড়ে। ম্যানগ্রোভ মানে জান তো? এই অঞ্চলের নোনা, কাদামাটিতে পাওয়া যায় না তেমন অক্সিজেন। এখানে যে গাছ জন্মায়, তারা শিকড় উঁচিয়ে ধরে হাওয়ায়, সেখান থেকেই খুঁজে নেয় অক্সিজেন। পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ জুড়ে ব্যাপ্ত সুন্দরবন একটি ইউনেস্কো হেরিটেজ সাইটও বটে। কোনও এক সময়ে দারুণ ঝড় হয়েছিল এই অঞ্চলে। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছিল বঙ্গোপসাগর। প্রলয়কাণ্ড থেমে যাওয়ার পর, জল সরে গিয়ে জেগে উঠেছিল দ্বীপটি। সুন্দরীগাছের থেকেই নাকি জায়গাটির নাম সুন্দরবন। সুন্দরবনে প্রায় ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী জন্তু পাওয়া গেলেও, জায়গার নাম বললেই প্রথমে মনে আসে, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার! সাঁতারে পটু বেঙ্গল টাইগারের মতো চতুর শিকারি নাকি পৃথিবীতে খুব কমই আছে। মানুষের সঙ্গে বুদ্ধিতে পাল্লা দেয় সে, মাঝনদীতে দাঁড়িয়ে থাকা নৌকো থেকেও তুলে নিয়ে যায় শিকার। প্রকৃতির নিয়মে, সুন্দরবনের বাঘের প্রধান খাবার চিতল হরিণ। কিন্তু চাষজমি এগিয়ে আসার ফলে, অঞ্চল থেকে কমতে শুরু করেছে চিতল। ফলে বাঘ বেছে নিয়েছে তার নতুন শিকার, মানুষ! হ্যাঁ, সুন্দরবনের বাঘ কিন্তু অক্ষম বা বুড়ো হলে নরখাদক হয় না। মানুষ এখন তার স্বাভাবিক খাদ্য। জঙ্গলে আরও বেশি করে-করে মানুষের প্রবেশ, বাঘের সঙ্গে মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই আস্তে-আস্তে বাঘকে ঠেলে দিচ্ছে অবলুপ্তির পথে। এই মুহূর্তে নাকি মাত্র ১৭০টি বাঘ বেঁচে আছে সুন্দরবনে!

টুয়ালাংয়ের মতো বিশাল গাছ, যার অপর নাম 'মৌমাছি গাছ'! টুয়ালাং প্রায় ২৮০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। কাণ্ডও তেমনই শক্ত।

● জীবজন্তু

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই বৃষ্টিঅরণ্যে এমন অনেক প্রাণীকে দেখতে পাবে, যাদের চট করে দেখা পাওয়া যায় না পড়ার বইয়েও। সুমাত্রা-বোর্নিওর জঙ্গলে দেখা মেলে এশিয়ার একমাত্র 'এপ'-এর। তার নাম ওরাংউটান। সুমাত্রার ভাষায়, এই শব্দটির মানে, জঙ্গলের মানুষ। আরও সহজ বাংলায়, 'বনমানুষ'! ওরাংউটানের হাত কতটা লম্বা হয় জান? আট ফুট! গাছের ডাল ফসকাবার কোনও সুযোগই নেই! এছাড়া আছে অনেক প্রজাতির গিবন বাঁদর। সুমাত্রার জঙ্গলে আরও অনেক মজার প্রাণী বাস করে। যেমন, ছোট্ট আয়তনের পিগমি হাতি। বা, প্রোবোসিস মাঙ্কি, যার এত্ত বড় নাক! বা, সুমাত্রার গন্ডার। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট এই গন্ডারটি বেশ মিষ্টি দেখতে, সারা গায়ে ভর্তি লোম। উড়ুক্কু সাপ, উড়ুক্কু কাঠবেড়ালি এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক কোমোডো ড্রাগন এই জঙ্গলের শোভা আরও বাড়িয়েছে।

শঙ্খচূড়

দুঃখের ব্যাপার, এশিয়ার জঙ্গলগুলোয় সবচেয়ে বড় সমস্যা, চোরাশিকার। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে গাছ কেটে নিয়ে যাওয়ার ধুম। চোরাশিকারিদের জন্য কড়া আইনের ব্যবস্থা থাকলেও, তার ফাঁক গলে প্রায়ই কাজ হাসিল করে যায় তারা। এশিয়ার অনেক অংশে এসব জন্তুজানোয়ারের দেহাংশের বাজার যে বড্ড ভাল! পিগমি হাতি, সুমাত্রার গন্ডার, সুমাত্রার বাঘের (পৃথিবীর বাঘগুলোর

উঁ!

বোর্নিও-সুমাত্রার জঙ্গলে দেখা মেলে র‍্যাফলেসিয়া ফুলের। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফুল। কিন্তু এই ফুলের গন্ধ...নাকে রুমাল! ঠিক পচা মৃতদেহের মতো গন্ধ বের হয় এই ফুল থেকে!

মধ্যে সবচেয়ে ছোট আয়তনের প্রজাতি এটিই) মতো অনেক প্রাণীই কিন্তু আজ অবলুপ্তির পথে। জন্তুজানোয়ারের কথা বলতে বসলে ভারতের জঙ্গলগুলোকেও বাদ দিলে হবে নাকি? সেখানে বাস করে বাঘ, এশিয়ান হাতি, একশৃঙ্গ গন্ডারের মতো জাঁদরেল পশু। আছে নীলগাই, ভারতীয় বাইসনও। সাপের রাজা শঙ্খচূড়ও ভারতেরই বাসিন্দা।

ইউরেশিয়া, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, উত্তর আমেরিকা

এতক্ষণ দিব্যি মহাদেশ অনুযায়ী ভাগ করে চলছিল জঙ্গলে গল্প। কিন্তু এবার একটু থমকাতেই হচ্ছে। আমরা এসে পড়েছি বোরিয়াল নামের বায়োমে। ভৌগোলিক ভাষায়, তাইগা ফরেস্ট। রাশিয়ান ভাষায় 'তাইগা' মানেই জঙ্গল। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বায়োম এটি। ইউরেশিয়া, স্ক্যান্ডিনেভিয়া এবং উত্তর আমেরিকার ঠান্ডা জায়গাগুলো জুড়ে ছড়িয়ে আছে এই জঙ্গল। প্রধান গাছ? ফার। ফলে, জঙ্গল বলতেই যে সবুজ উঁকি দেয় আমাদের মনে, তার বিশেষ দেখা পাওয়া যায় না এখানে। বরং পাওয়া যায় প্রচুর বরফ! ফলে, বোঝাই যাচ্ছে, বৃষ্টিঅরণ্যের মতো অত গাছপালা-জন্তুজানোয়ারের দেখা পাওয়া যাবে না এখানে। বরং থাকবে গম্ভীর যত জন্তুজানোয়ার। উত্তরে জঙ্গলে কে-কে বাস করে, দেখে নেওয়া যাক!

খরগোশকে তাড়া করেছে মাউন্টেন লায়ন

গ্রিজলির হুঙ্কার

প্রথমেই বলা দরকার, ভল্লুকদের কথা। আমেরিকান ব্ল্যাক বেয়ার এবং গ্রিজলি, দুই ধরনের ভল্লুকের দেখা মেলে তাইগায়। এই দু'টি জানোয়ারই চেহারায় বিশাল। বহরে এবং উচ্চতায় দাপুটে। অথচ, দৌড়তে পারে ৪০-৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে! ভল্লুক সর্বভুক প্রাণী। গাছপালা থেকে শুরু করে বুড়ো হরিণ, এরা সবই খায়। নদীতে দাঁড়িয়ে থাবা দিয়ে মাছ ধরে খেতেও ভালবাসে। শিকারের ধাক্কায় গ্রিজলি ভল্লুক আমেরিকার বুক থেকে প্রায় অবলুপ্ত। তাইগার জঙ্গলের দুই সুন্দরী শিকারি ইউরেশিয়ান লিংক্স এবং পুমা। ছোট হরিণ বা খরগোশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে তাদের শিকার করে এই 'বিল্লি'রা। খুব কম অঞ্চলে বাস করে আর-একটি অবলুপ্তপ্রায় প্রাণী। সাইবেরিয়ান টাইগার। ব্যাঘ্রবংশের সবচেয়ে বড় এবং ভারী সদস্য। ওজন প্রায়শই ৩০০ কেজির উপরে। সাইবেরিয়ান বাঘের প্রধান খাদ্য আবার এল্‌ক বা রেনডিয়ার জাতীয় বল্লাহরিণ। তাইগায় এছাড়াও আছে ধূসর নেকড়ে, রেড ফক্স এবং এদের প্রিয় খাদ্য স্নোশু র‍্যাবিট! শেষের এই পশুগুলোর গায়ের লোমশ কোটটি খুব মজার। শীতকালে থাকে এক রকম, গ্রীষ্মে এক। ধূসর কোট শীতকালে হয়ে যায় ধপধপে সাদা। এতে ঠান্ডাও বাঁচে, ছদ্মবেশও হয়! এই জঙ্গলে আরও একটি প্রাণীর দেখা পাওয়া যায়। কমিক-সুপারহিরোর নামে যার নাম,

আশ্চর্য সুন্দর

বোরিয়াল বা তাইগা ফরেস্টের সবচেয়ে সুন্দর আর আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য কিন্তু কোনও জন্তুজানোয়ার নয়। সেটি একটি আকাশ-কাণ্ড। সকালবেলার গ্রিক দেবী অরোরার নামে এই প্রাকৃতিক কাণ্ডটির নাম, 'অরোরা বোরিয়ালিস' বা 'নর্দার্ন লাইটস'। সৌর ঝড়ের দাপটে আকাশে রঙের মেলা বসে যায়। অন্ধকার আকাশে এই দৃশ্য সত্যিই অভূতপূর্ব!

মিষ্টি কোয়ালা

সেই উলভারিন!

অস্ট্রেলিয়া

এবার পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দ্বীপটির কথায় আসব। অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব প্রান্তের দিকে চোখ রাখলে, আমরা পাব একটি বিস্তৃত টেম্পারেট ফরেস্ট। ইউক্যালিপ্ট ফরেস্টও বলে এই জঙ্গলকে। কারণটি অতি স্বাভাবিক। প্রধান গাছের নাম যে ইউক্যালিপ্টাস! গাছের বেশি প্রজাতি বিভাগ যখন খুঁজে পাওয়া গেলই না, আসা যাক জীবজন্তুর জগতে।

অস্ট্রেলিয়া কিন্তু আরও এমন একটি জায়গা, যার পশুপাখি একটু বিশেষ, যাদের এখানেই শুধু পাওয়া যায়! খুঁজেও, অন্য জায়গায় এদের পাওয়া মুশকিল। প্রথমেই বলতে হয় মার্সুপিয়াল জাতীয় স্তন্যপায়ীদের কথা। এরা সবাই, ছোট্ট সন্তানকে 'পাউচে' নিয়ে ঘোরে। সবচেয়ে চেনা মার্সুপিয়াল ক্যাঙারু তো আছেই, অপোসাম, ওম্ব্যাট, ওয়ালাবি...মার্সুপিয়াল পরিবারের সদস্যসংখ্যা নিতান্ত কম নয়। আছে কোয়ালা। জান তো, মিষ্টি এই প্রাণীটি জল খায়ই না। তার প্রধান খাদ্য ইউক্যালিপ্টাস পাতা থেকেই সে পেয়ে যায় প্রয়োজনীয় জল। আরও একটি অদ্ভুত প্রাণী হংসচঞ্চু প্ল্যাটিপাস। এটি পৃথিবীর একমাত্র স্তন্যপায়ী, যে আবার ডিমও পাড়ে! পাখিদের মধ্যে আছে 'নকলবাজ' পাখি লায়ারবার্ড। যে-কোনও শব্দের হুবহু নকল করতে এর জুড়ি নেই। তবে, অস্ট্রেলিয়ান সাপেদের কাছ থেকে খুব সাবধান। এত রকম বিষাক্ত সাপ কিন্তু আর কোনও মহাদেশেই পাওয়া যায় না!

এবার বোঝা গেল তো, জঙ্গল কতটা সুন্দর, আকর্ষক এবং দরকারি? পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হলে, প্রকৃতির এই দুর্দান্ত সৃষ্টিকে আমাদের বাঁচাতেই হবে।

বিষদাঁত

সবচেয়ে বিপজ্জনক মাকড়সার বাস অস্ট্রেলিয়ায়। নাম, সিডনি ফানেল ওয়েব স্পাইডার। প্রচণ্ড বিষাক্ত তো বটেই, এটি কুখ্যাত এর 'ফ্যাং'-এর জন্য। অনেক নামী-দামি সাপের চেয়েও বড় এর দংষ্ট্রা। সেই 'কামড়'-এর জোরে ফেটে যেতে পারে নখ! বছরকুড়ি আগে অ্যান্টি-ভেনম আবিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর এই মাকড়সার কামড়ের ভয় কমে গিয়েছে অনেকটাই।

ঘোষণা

এই ব্যাপারে কি একমত হবে, প্রিয় জিনিস খুব কম হয়? অপ্রিয় জিনিসেরই চারদিকে অভাব নেই। সকাল-বিকেল লেখাপড়া করা, আজেবাজে জিনিস খাওয়া আর খেলার সময় বই মুখে নিয়ে বসা, এ সবই তো আমাদের বড্ড অপ্রিয়। তার মধ্যে দু'-একটা প্রিয় জিনিসের জন্যই মনটা বড় খুশি হয়ে ওঠে, জীবনটা ভারী ভাল লাগে। প্রিয় কিছু নিয়ে কথা বলতে পারলে তো আমরা কিছুই চাই না। কিন্তু এর সুযোগ বেশি পাই কোথায়? এই কাজটাই তুমি এবার করে ফেলতে পার তোমার প্রিয় আনন্দমেলার পাতায়। যেমন ধরো এই প্রিয় খাবার। ভাত, মাছ, ডাল, তরকারি দেখলে আমাদের অনেকেরই নাক কুঁচকাতে ইচ্ছে করে, কিন্তু চাউমিন বা পাস্তা দেখলেই তো আহ্লাদে ডগমগ হয়ে যাই। এরকম প্রিয় খাবারের কথা লিখে পাঠাও না আমাদের। খাবারের সঙ্গে এরকমই আরও অনেক প্রিয় জিনিসের মজা ভাগ করে নাও আনন্দমেলার সব বন্ধুদের সঙ্গে। একশো শব্দের মধ্যে লিখে পাঠাও নীচের তালিকার নিজের পছন্দের জিনিস। যদি একের বেশি পছন্দের জিনিস লেখো, তা হলে আলাদা-আলাদা কাগজে লিখতে হবে প্রত্যেকটা বিষয়। একজনে পাঁচটি বিষয়ের বেশি লিখো না কিন্তু।

বিষয় তালিকা

প্রিয় খেলা। প্রিয় বই। প্রিয় গান। প্রিয় মানুষ। প্রিয় ছবি। প্রিয় নাটক। প্রিয় খাবার। প্রিয় বেড়ানোর জায়গা। প্রিয় গাড়ি। প্রিয় গৃহপালিত পশু। প্রিয় শিক্ষক। প্রিয় মাছ। প্রিয় পাখি। প্রিয় জামা। প্রিয় খেলনা।

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি। খুব বেশিদিন বাকি নেই। দেরি করে ফেলো না কিন্তু।

মজার ঝাঁপি

মণিমেলা পঁচাত্তর

মণিমেলার পঁচাত্তর

শিশু-কিশোরদের নিয়ে ভারতে সর্বপ্রথম যে রেজিস্ট্রিকৃত সংগঠন তৈরি হয়েছিল, তার নাম 'মণিমেলা'। আনন্দবাজার পত্রিকার 'আনন্দমেলা'র রবিবারের পাতার সম্পাদক বিমল ঘোষের (মৌমাছি) ডাকে সাড়া দিয়ে ভারত জুড়ে তৈরি হয়েছিল মণিমেলা। আজ তার বয়স হল পঁচাত্তর। শিশুকিশোরদের কাছে আজও সমান জনপ্রিয় এই সংগঠন। গত ১৫ অগস্ট এই মহাকেন্দ্রের কেন্দ্রমণি অমিত ঘোষ ও নৈহাটি মণিমেলার মণিরক্ষক (সচিব) হেমন্ত নাথ বৃক্ষরোপণের মধ্যে দিয়ে সংগঠনের প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেছিলেন। তারপর একে-একে পালিত হল রাখিবন্ধন উৎসব, শারীর শিক্ষণ শিবির, পথ পরিক্রমা, নৃত্য প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, সারা বাংলা বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। প্ল্যাটিনাম জুবিলির শেষ অনুষ্ঠানটি পালিত হবে ১৮ মার্চ, বিমল ঘোষের ১০৭তম জন্মজয়ন্তী পালনের মধ্যে দিয়ে।

ছোটদের নাট্য উৎসব

চেতলা কৃষ্টি সংসদ আয়োজিত ২৩তম 'শিশু নাট্যোৎসব ২০১৫' সম্প্রতি হয়ে গেল মুক্ত অঙ্গন রঙ্গালয়ে। তিনদিনের এই উৎসবে ছিল ছ'টি নাটক, 'সুতোর লড়াই', 'হ য ব র ল', 'আজব হাঁড়ি', 'জুতা আবিষ্কার', 'টাকার আপদ' ও 'ঠকারাম ঠগবাজ'। কৃষ্টি সংসদের শিশুরা ছাড়াও শহর ও জেলার বিভিন্ন নাট্যদল এই আনন্দ উৎসবে অংশ নিয়েছিল।

নাট্য উৎসব

বিডন স্ট্রিট শুভম

ইংরেজি বর্ষ শেষে মিনার্ভা থিয়েটারে 'বিডন স্ট্রিট শুভম' ও আয়োজন করেছিল তিনদিনের শিশু নাট্যমেলা। চোদ্দতম এই মেলায় ছোটরা ছ'টি নাটক মঞ্চস্থ করে। 'অবাক জলপান', 'ঘ্যাঁঘাসুর', 'ভাড়াটে চাই', 'হ য ব র ল', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'অথঃ শিক্ষা বিচিত্রা'।
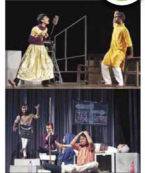
পিছু পিছু আসে

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

পেমাং রাস্তার পাশে এসে দেখল কাছের গুম্ফা থেকে বেরিয়ে এসে কিছু বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী শিয়ক নদীর জলে মাছ ছাড়ছে। এগুলো ওরা আশপাশে বরফ হয়ে জমে যাওয়া ছোট-ছোট জলাশয় থেকে উদ্ধার করে এনেছে। বিপন্ন মাছেদের এইভাবে জলে ছেড়ে বাঁচিয়ে রাখাকে বৌদ্ধরা পবিত্র কাজ বলে মনে করে।

সামনের উপত্যকায় শিয়ক নদী মিশেছে নুব্রা নদীর সঙ্গে। তারপর দুই প্রবাহ মিলেমিশে বয়ে গিয়েছে সিন্ধু উপত্যকার

দিকে। এখানে পাহাড়ের উপর বেশ কিছুটা প্রশস্ত সমতল। সেই সমতল সবুজ ঘাস-জমির এক দিকে পেমাংদের ভেড়াগুলো চরে খাচ্ছিল। একটা হাড়কাঁপানো ঠান্ডা হাওয়া বইছে। পেমাং নিজেকে গরম চাদরে মুড়ে রাস্তার পাশের বড় পাথরটার উপর বসল।

এমন সুন্দর দৃশ্যের সামনে বসেও পেমাংয়ের মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। রাস্তা ধরে একটা ব্যাকট্রিয়ান উটে চেপে সেংগেই আসছে। পেমাং জানে এইভাবে তাকে একলা পেয়ে সেংগেই উৎপাত করবেই। হয়তো তেড়ে এসে জোরে ধাক্কা মারবে। নিজের গায়ের জোর ফলাতে হয়তো হাত মুচড়ে দেবে। সেংগেই পেমাংয়ের দাদার বয়সি, তবু পেমাংয়ের মতো কিশোরদের উপর দাদাগিরি ফলিয়ে ও ভীষণ মজা পায়। পেমাং তাই এগিয়ে আসা বিপদের প্রহর গুনছিল। দাদা না থাকলে সেংগেইয়ের সামনে ওর নিজেকে খুব দুর্বল আর অসহায় বলে মনে হয়। সেংগেই পেমাংকে দেখে থামল। ব্যঙ্গ করার স্বরে মুখ বাঁকিয়ে বলল, "এইরে! তোর পিছনে স্যাংকো!"

পেমাং এই আচমকা চিৎকারে চমকে উঠতেই সেংগেই বিকট শব্দ করে হাসতে লাগল। "তোকে নেকড়েতে ধরবেই। দুর্বল ছেলেদের মাংস নেকড়ের খুব প্রিয়!" এই বলে সে অট্টহাস্য করতে-করতে শিয়ক নদীর ছোট সেতুটা পেরিয়ে পাহাড়ের বাঁকে হারিয়ে গেল।

পেমাং ভাবতে চায়নি, তবু সেংগেইয়ের কথায় মনে পড়ে গেল। আজ তো পূর্ণিমা! লামা গিয়াসো যে পূর্ণিমার কথা বলেছিলেন, আজ সেই দিন! সেই রহস্যজনক ঘটনার পর এক মাস পার হয়ে গিয়েছে। এই এক মাসে তাদের যাযাবর গোষ্ঠী কত পথ পার হয়ে এসে এই খারদুং গ্রামের একপ্রান্তে তাঁবু ফেলেছে। পেমাংয়ের পরিবারও এই যাযাবরদেরই সঙ্গী।

আগের পূর্ণিমায় পেমাংরা ছিল তিব্বতের সীমানার কাছে লাদাখের রুক্ষ প্রত্যন্ত প্রান্তে। গোষ্ঠীর সবাই তখন খুব চিন্তিত ছিল। পরপর পাঁচটি ভেড়া ও তিনটি পশমিনা ছাগল হিংস্র পশুর শিকার হয়েছে। একটি ক্ষেত্রে তুষারচিতার আক্রমণের প্রমাণ পাওয়া গেলেও বাকি ক্ষেত্রে কিছু বোঝা যায়নি। গোষ্ঠীর সবাই আলোচনায় বসেছিল। আরও কয়েকটা দিন এই এলাকায় থাকতে হবে তিব্বতিদের সঙ্গে ব্যবসাসংক্রান্ত পাওনাগন্ডা বুঝে নেওয়ার জন্য। তারপর তারা বসবাস গুটিয়ে নুব্রা ভ্যালির দিকে রওনা দেবে।

গোষ্ঠীপ্রধান বললেন, "স্যাংকো! এই ভেড়াগুলোকে ওই নেকড়েতেই টেনে নিয়ে গিয়েছে। হঠাৎ করে বড্ড ক্ষতি করছে নেকড়েতে।"

সবাই ঘাড় ঝাঁকিয়ে মত দিল নেকড়ের ফাঁদ পাতার। পাহাড়ের গায়ে একটু প্রশস্ত জায়গা দেখে পাথর সাজিয়ে-সাজিয়ে একটা কূপ বানাল সকলে মিলে। ঠিক চওড়া মাঝারি গভীর পাতকুয়ো যেমন হয়। এর ভিতর একটা ভেড়াকে টোপ হিসেবে রেখে দেওয়া হল। ভেড়ার লোভে নেকড়েটা এই পাথরে ঘেরা পাতকুয়োয় লাফিয়ে নামবে, কিন্তু শিকারের পর ফের উঠে আসতে পারবে না। তখন আগামিকাল সকালে উপর থেকে পাথর ছুড়ে-ছুড়ে মেরে ফেলা হবে নেকড়েটাকে। পেমাং নিজের তেরো বছরের জীবনে এমন ঘটনা দেখেনি। সে মাঝেমধ্যে রাস্তার ধারে সাইনবোর্ডে নেকড়ে নিয়ে লেখা দেখছে। 'স্যাংকো বা তিব্বতি নেকড়ে একটি বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী'। কিন্তু সেই নেকড়ে স্বচক্ষে দেখেনি কখনও। সন্ধে থেকেই পেমাং তাই একটু অজানা উত্তেজনায় সজাগ ছিল। সত্যিই কি টোপ দিয়ে নেকড়েটাকে ফাঁদে ফেলা যাবে?

অন্ধকার নামার কিছু পরেই চাঁদের আলোর ফিনিক ফুটেছিল উপত্যকা জুড়ে। তাঁবুর মধ্যে পেমাংয়ের ঘুম আসছিল না। অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করে মাঝরাতে পেমাং পরদা সরিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল। আজ চাঁদের রং এমন লালচে কেন? দূরের ওই বাদামি পাহাড়ের ছায়া পড়েছে চাঁদের উপর? বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে পেমাং তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াল। ঠিক তখনই সে একটা আওয়াজ পেয়ে চমকে উঠল। পা টিপে-টিপে একটা বড় পাথরের আড়ালে গিয়ে দেখতে চাইল ব্যাপারটা। পেমাং দেখল দুপুরে বানানো নেকড়ে ধরা ফাঁদের কাছে একজন অন্য রকম মানুষ চাঁদের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে। সে যেন কিছু অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটাবার জন্য নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছে। লোকটা নিজের শরীর টানটান করে ঝুঁকিয়ে নিল। তার চোখেমুখে শ্বাপদ শিকারির মতো হিংস্র ভাব ফুটে উঠছে। ওটা কি মানুষ? না অন্য কিছু?

পেমাং ভীষণ ভয় পেয়ে দৌড়ে তাঁবুতে ফিরে এল। দাদাকে জড়িয়ে ধরে চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে বাইরে একটা হইচই পড়ে গেল। ফাঁদ থেকে নাকি নেকড়ে ভেড়া তুলে নিয়ে পালিয়েছে। গোষ্ঠীর বড়রাও ভীষণ অবাক হয়ে চেঁচামেচি করছিল। পুরুষানুক্রমে এই রকম ফাঁদ বানিয়েই নেকড়েদের শায়েস্তা করে এসেছে তারা। এ জিনিস কখনও ব্যর্থ হতে পারে না! গতকাল যারা পাথর সাজিয়ে-সাজিয়ে ফাঁদ বানিয়েছিল তারা সকলেই মুখ গোমড়া করে বসেছিল। ভাবছিল নেকড়েটা অমন ভারী ভেড়াটাকে ফাঁদের গর্ত থেকে তুলে নিয়ে গেল কী করে?

একমাত্র পেমাং চুপচাপ ছিল। কাল সে ওই ফাঁদের সামনে অন্য কিছুই দেখেছে। কিন্তু সে কথা বললে বড়রা কি বিশ্বাস করবে?

পেমাং যাযাবরদের তাঁবু ছাড়িয়ে

আর-একটু উত্তর দিকে হেঁটে গেল। সেপ্টেম্বর শেষ হতে চলল, আবহাওয়া প্রতিকূল হচ্ছে ধীরে-ধীরে। এবার দুর্গম এলাকা ছেড়ে লোকালয়ের দিকে চলে যাবে তারা। শীত পড়ার আগে এমনটাই হয়ে এসেছে প্রতি বছর। আবার বসন্ত

এলে জানা যাবে কালো গলার সারসদের আসার সময় হয়েছে। স্থানীয় লোকেরা আনন্দ করবে এই ভেবে যে, সারসরা সুদিনের খবর নিয়ে আসছে। তখন আবার অজানা সৌভাগ্যের খোঁজে পাড়ি দেবে যাযাবররা। পেমাং রাতের ভয়টা মুছে ফেলতে সারসদের কথা ভাবতে চেষ্টা করল। ভাবতে বসে ভুলে গেল ছেলেবেলায় শোনা গল্পগুলোর কথা। এই উত্তরের এলাকাটা নিয়ে কত ভয় আর রহস্যের গল্প শুনেছিল সে। এক বিদেহী লামার গল্প। তাঁর ভৌতিক গুম্ফার গল্প। কিন্তু সব ছাপিয়ে কাল রাতে নিজের চোখে দেখা ভয়ানক দৃশ্যটায় সে আচ্ছন্ন হয়েছিল। পেমাং আনমনা হয়ে পড়েছিল। পাশে কারও এসে বসা টের পেল না। তাই আচমকা ঘাড় ফিরিয়ে প্রথমে চমকে উঠেছিল। বৃদ্ধ লোকটা পেমাংকে দেখে একগাল হেসে বলল, "ভয় পেয়ো না।"

পেমাং বৃদ্ধ মানুষটার দিকে স্থিরভাবে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। মানুষটার মাথা নেড়া, চোখদুটো কোটরগত, গায়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিকের পোশাক। বয়সের ভারে মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছে। ইনিই কি লামা গিয়াসো? পেমাং যখন আরও ছোট ছিল, তখন এই এলাকায় তাঁবু পড়লে দাদা লামা গিয়াসোর গুম্ফার গল্প শুনিয়ে ভয় দেখাত। তিনি নাকি নানা রকম অলৌকিক বিদ্যা জানেন। তাঁর গুম্ফায় মানুষখেকো নেকড়ের আত্মা পোষ মানানো আছে। লামা গিয়াসো নিজে মাঝেমধ্যে মানুষের কাছে আসেন। কিন্তু কোথা থেকে আসেন কেউ জানে না। তাঁর গুম্ফায় যাওয়ার রাস্তাও কেউ চেনে না। পেমাংয়ের ভিতরটা ভয়ে কেঁপে উঠল। কিন্তু সে ভয় লুকিয়ে বৃদ্ধ মানুষটার হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি ভয় পাইনি।"

"কিন্তু আমি যে দেখতে পাচ্ছি, তোমার চোখেমুখে ভয় লেগে আছে।"

"সে তো কাল রাতের ওই নেকড়ে..." পেমাং বলতে গিয়ে থেমে গেল। ওর মন থেকে তখনও রাতের দুঃস্বপ্নের ছায়া সরেনি।

পেমাংয়ের শেষ না হওয়া কথাটা নিয়ে লামা গিয়াসো মাথা ঘামালেন না। তিনি একটা কৌটো বের করে পেমাংয়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "এটা তোমার জন্য।"

তারপর নিজের মনেই বিড়বিড় করে বললেন, "ও নিজেকে মুক্ত করে পালিয়েছে। ক্ষতি করে বেড়াবে বলে নিজের শক্তি বাড়িয়ে চলেছে। ওকে থামানো দরকার।"

পেমাং নকশা করা কৌটোটা হাতে পেয়ে অবাক হয়ে বলল, "এটা কী?"

"ধুটসিলোমা (অ্যাকোনিটাম নাপেলাস) গাছের শিকড় থেকে বানানো বিষ। এটা আমি ধা-হানু উপত্যকা থেকে এনেছি। ওখানকার ব্রোকপা উপজাতির লোকেরা এটা তিরের ফলায় লাগিয়ে শিকার করে। তুমি তো সাহসী ছেলে। ও তোমাকে দেখেছে। তোমার পিছু নিয়েছে। পরের পূর্ণিমায় হয়তো নিজের আসল চেহারায় ফিরে..."

> মানুষটার মাথা নেড়া, চোখদুটো কোটরগত, গায়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিকের পোশাক। বয়সের ভারে মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছে। ইনিই কি লামা গিয়াসো? পেমাং যখন আরও ছোট ছিল, তখন এই এলাকায় তাঁবু পড়লে দাদা লামা গিয়াসোর গুম্ফার গল্প শুনিয়ে ভয় দেখাত।

একথা শুনে পেমাংয়ের গাল শুকিয়ে গেল। এ কী বলছেন লামা গিয়াসো! কালকের ওই ভয়ানক ব্যাপারটা পরের পূর্ণিমায় ফিরে আসবে?

পেমাং ক্ষীণ স্বরে বোকার মতো জিজ্ঞেস করল, "পরের পূর্ণিমা কত দূর?"

"এক মাস। তার মধ্যে তোমায় নিজেকে তৈরি করতে হবে। তুমি যাযাবর। আত্মরক্ষার জন্য এই রুপোর ছোরাটা রাখো। কাজে লাগবে।"

বৃদ্ধ গিয়াসো নিজের লাল চাদরটা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে নিলেন। তারপর ঘোষণা করার মতো করে বললেন, "পেমাং, পরের পূর্ণিমায় লাল চাঁদ উঠবে। সেই চাঁদ থেকে লাল রঙের জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়বে উপত্যকায়। তারপর সেই জ্যোৎস্না লেগে থাকবে উইলো গাছের পাতায়। রক্তের ফোঁটার মতো।"

লামা গিয়াসোর পুরো কথাটাই পেমাংয়ের কাছে তান্ত্রিক মন্ত্রপাঠের মতো শোনাল। সে শুধু হতবাক হয়ে চেয়ে রইল, লামা গিয়াসোর দুশ্চিন্তায় নুয়ে পড়া শরীরটা আস্তে-আস্তে পায়ে চলা রাস্তা ধরে পাহাড়ের কোলে হারিয়ে যাওয়া পর্যন্ত।

পেমাংয়ের বিশ্বাস হচ্ছিল না যে লামা গিয়াসোকে নিয়ে এত গল্প, তিনি সামনে এসেছিলেন। তাকে নিজের হাতে দুটো জিনিস দিয়ে গিয়েছেন। আরও কিছুক্ষণ পর পেমাং তাঁবুর কাছে ফিরে এসে দেখল নেকড়ের ফাঁদ থেকে ভেড়া হারিয়ে যাওয়া নিয়ে তুলকালাম বেঁধেছে। যারা কাল কূপ তৈরি করেছিল তাদের দোষ দিচ্ছে সেংগেই ও তার দলবল। সেংগেই বছরবাইশের যুবক। বলিষ্ঠ ও রগচটা। গোষ্ঠপ্রধানের অবাধ্য হয়ে প্রায়শই হটকারী কাণ্ড করে বসে। শোনা যায় ও নাকি লামা গিয়াসোর প্রেতগুম্ফার খোঁজে অভিযান করেছিল। তারপর এক বছর নিরুদ্দেশ থাকার পর কিছুদিন আগে গোপনে ফিরে এসেছে। তবে ফিরে আসার পর থেকে সেংগেইয়ের স্বভাব আরও হিংস্র হয়েছে।

যে ছেলেগুলো নেকড়ের ফাঁদ বানিয়েছিল, তাদেরকে অকর্মা বলে দোষ দিয়ে একচোট মারমুখী ভাব দেখাল সেংগেই। যেন সে নিজেই গোষ্ঠীপতি। পেমাং পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার সময় আড়চোখে তাকাল সে। তারপর পেমাংয়ের স্বঘোষিত অভিভাবক হয়ে ধমক দিয়ে বলল, "আশপাশে কোথাও নেকড়ে লুকিয়ে রয়েছে, আর তুই একলা ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন রে!"

এর পর সেংগেই দেখা হলেই পেমাংকে ধমকাতে লাগল। পেমাংয়ের বিরক্ত লাগলেও কাউকে বলেনি। কারণ,

দাদার কানে গেলে এই অনধিকার চর্চা নিয়ে একচোট হাতাহাতি হয়ে যাবে সেংগেইয়ের সঙ্গে। পেমাং নরম মনের ছেলে। সে এইসব ঝামেলা পছন্দ করে না। তার ভাল লাগে যাযাবর হয়ে একটা সুন্দর জায়গা থেকে অন্য সুন্দর জায়গায় ঘুরে বেড়াতে। কী সুন্দর এই বরফ-পাহাড়, খরস্রোতা নদী, সৌভাগ্যের খবর বয়ে আনা কালো গলার সারস আর তাদের চঞ্চল ছাগলগুলো, ভেড়াগুলো।

তবু লামা গিয়াসোর কথাগুলো মনে করে পেমাং নিজেকে তৈরি করছিল। দাদার উৎসবের সময় নিশানা দেখানোর তির-ধনুকটা নিয়ে অদূরে একটা টার্গেট করে তির ছোড়া অভ্যেস করছিল। হঠাৎ সেদিন সেংগেই এসে ধনুকটা কেড়ে নিয়ে বলল, "বাচ্চা ছেলে, ধনুক নিয়ে কী করছিস! এসব ছোটদের খেলার জিনিস নয়!"

পেমাং শুধু গম্ভীর গলায় বলেছিল, "ওটা আমায় দাদা খেলতে দিয়েছে, ফেরত দাও বলছি! না হলে কিন্তু দাদাকে বলে দেব।"

পরদিন সন্ধেয় পেমাংয়ের দাদা জখম হল। ভেড়া চরিয়ে ফেরার সময় সে নেকড়ের ডাক শুনতে পেয়ে একটু সতর্ক হয়ে পাহাড়ের ঢালে ঝুঁকে দেখতে গিয়েছিল। কেউ তখন তাঁকে পিছন থেকে ঠেলে দেয়। খাদে পড়েই যাচ্ছিল। কোনও রকমে সামলে নিলেও পাথরে আছাড় খেয়ে চোট পেয়েছে মারাত্মক। দূরের গ্রাম থেকে একজন আমচি (স্থানীয় কবিরাজ) ডেকে আনলেন গোষ্ঠীপ্রধান। সে গাছগাছড়ার পাতা-শিকড় বেটে ক্ষতস্থানগুলোয় লাগিয়ে দিল। দাদার বেশিদিন শুয়ে থাকা হয়ে ওঠেনি। এর পর পরেই একদিন তাঁবু গুটিয়ে নুব্রা ভ্যালির দিকে রওনা দিল পেমাংদের যাযাবর গোষ্ঠী।

পেমাং একমনে দেখছিল নিজেদের ভেড়াগুলোকে আর ভাবছিল আজ সেই পূর্ণিমা। যার কথা লামা গিয়াসো বলেছিলেন। বিগত এক মাস সময়টা ভাল না গেলেও তেমন ভয়ানক কোনও কিছু তো পিছু-পিছু আসেনি। বরং গোষ্ঠীর অনেকেই খুশি এই উপত্যকায় এসে। কারণ, নেকড়ের ছায়া থেকে সরে আসা গিয়েছে। পশমিনা ছাগল আর ভেড়া যে একটা-দুটো হারায়নি তা নয়। তবে সেগুলো যাত্রাপথে স্বাভাবিক খোয়া যাওয়া বলে তারা মেনে নিয়েছে।

তবু আজ পূর্ণিমা। সন্ধে হয়ে আসছে। পেমাং নিজের পিছনটা দেখে নিল ভাল করে। সে লামা গিয়াসোর কথামতো নিজেকে প্রস্তুত রেখেছে। অ্যাকোনাইট বিষে ডুবিয়ে রুপোর ছোরাটা কোমরের খাপের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু কেউ কি সত্যিই পিছু-পিছু আসে? ছায়ার মতো? কোনও নেকড়ে? না মানুষ?

নাকি নেকড়ে-মানুষ? এক মাস আগে সেই রাতে কাকে দেখেছিল পেমাং? সে কি এত দূরে এতটা পথ পেরিয়ে চলে এসেছে পিছন-পিছন? পেমাংয়ের ভয় লাগল ভাবতে-ভাবতে। পিছনে আর-একবার তাকিয়ে সামনে তাকাল। দেখল, ব্যাকট্রিয়ান উটে চেপে সেংগেই ফিরে আসছে রাস্তা ধরে। পাশ দিয়ে যেতে-যেতে বলল, "আজ অক্টোবরের পূর্ণিমা। ইউরোপে ভূতে ভয় পাওয়া লোকেরা একে বলে ব্লাডমুন। আজকের দিনটা মানুষখেকো নেকড়েদের দিন।"

এই বলে সেংগেই অট্টহাস্য করে বলল, "স্কুলে তো পড়িসনি, কিছুই জানিস না।"

পেমাংয়ের কথাটা শুনে রাগ চড়ে গেল। তাদের যাযাবরদের কে কবে স্কুলে পড়েছে? তাদের যা শিক্ষা সবই বংশপরম্পরার অভিজ্ঞতা থেকে। সেংগেই যে এত বড়-বড় কথা বলছে,

সে নিজে কোন স্কুলে পড়েছে? আজ দল-পালিয়ে পাঁচ ঘাটের জল খেয়ে ইউরোপ দেখাচ্ছে!

পেমাং রাগে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

সেংগেই যাতে বিরক্ত করতে না পারে তাই উঠে দাঁড়িয়ে কিছু দূরে শিয়ক নদীর উপর ছোট সেতুটার দিকে এগিয়ে গেল। ভাবল, সেতু পেরিয়ে কাছে গুম্ফা থেকে একটু ঘুরে আসা যাক। অন্তত সেংগেইয়ের হাতে হেনস্তা হওয়ার থেকে পালিয়ে বাঁচা যাবে। আজ সেংগেইকে আটকাবার মতো কেউ নেই। দাদাকে নিয়ে বাবা ডাক্তার দেখাতে গিয়েছেন ডিস্ট্রিক্ট শহরে।

যেতে-যেতে পেমাংয়ের মনে হল হঠাৎ করে সেংগেই বারবার নেকড়ের কথা তুলছে কেন? নিশ্চয়ই একা দেখে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে। নাকি ও জানতে পেরেছে কিছু? পেমাং তো কাউকে বলেনি। লামা গিয়াসো সিদ্ধ মানুষ। তিনি পেমাংয়ের ভয় পাওয়াটা টের পেতে পারেন। কিন্তু সেংগেই বদমাশ ছেলে, সে কী করে বুঝবে?

পেমাং হাঁটতে-হাঁটতে ব্রিজ পার হয়ে প্রথমে গুম্ফায় গেল। ভাবগম্ভীর পরিবেশে সামনের জ্বলন্ত আগুনের দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে ভাবল লামা গিয়াসোর গুম্ফা নিয়ে কতই না ভয় দেখানো হত। সেখানে মানুষখেকো নেকড়ে... ভাবতে গিয়ে হঠাৎ করে পেমাংয়ের মাথায় এল লামা গিয়াসোর একটা কথা। সে পালিয়েছে! কে পালিয়েছে? লামা গিয়াসো কি ক্ষতিকর প্রেতাত্মাদের নিজের গুম্ফায় বন্দি করে রাখতেন? তাদের কেউ পালিয়েছে? সেই কি পেমাংয়ের পিছু নিয়েছে?

পেমাং গুম্ফা থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে গোল চাঁদ উঠেছে। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া গরম পোশাক ভেদ হাড় কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। পেমাং হাতে হাত ঘষে গরম করতে-করতে তাঁবুর দিকে ফিরতে লাগল। কিন্তু শিয়ক নদীর সেতুর কাছটায় এসে থমকে দাঁড়াল। একটা ভেড়াকে কিছুতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নদীর তীর বরাবর। একটু আগে ওই সবুজ ঘাস জমিতে তো পেমাংদের ভেড়াগুলোই ছিল! পেমাং ব্যস্ত হয়ে ব্রিজের কাছে দৌড়ে গেল। চারপাশে কোনও জনমানুষের দেখা নেই যে কাউকে ডাকবে সাহায্যের জন্য।

পেমাং ব্রিজের উপর গিয়ে নদীর দিকে ঝুঁকে তাকাল।

"ওদিকে নয়, নেকড়ে এখানে!"

পেমাং ঘাড় ফিরিয়ে সেতুর অন্য প্রান্তে দেখতে পেল সেংগেইকে। কিন্তু এ কোন সেংগেই? এই ভয়ানক ঠান্ডাতেও আদুল গা। হাতে-পায়ে ঘন লোম। যেন নেকড়ে ও মানুষের মাঝামাঝি এক ভয়ঙ্কর জন্তু!

সেংগেই তার দাঁত-নখ বের করে

পেমাং হাতে হাত ঘষে গরম করতে-করতে তাঁবুর দিকে ফিরতে লাগল। কিন্তু শিয়ক নদীর সেতুর কাছটায় এসে থমকে দাঁড়াল। একটা ভেড়াকে কিছুতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নদীর তীর বরাবর। একটু আগে ওই সবুজ ঘাস জমিতে তো পেমাংদের ভেড়াগুলোই ছিল!

বলল, "সেদিন নেকড়ের ফাঁদের পাশে তুই আমায় দেখেছিলি না? লামা গিয়াসোর প্রেতগুম্ফার যে রহস্য আমার মধ্যে আছে তা তুই জেনে ফেলেছিস!"

সেংগেইয়ের গলার স্বরে পেমাংয়ের হাত-পা থরথর করে কেঁপে উঠল।

সেংগেই ঘোলাটে চোখে আকাশে চাঁদের দিকে ঘাড় তুলল। নিজেকে টানটান করে আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে হিংস্র দৃষ্টি ফেলল পেমাংয়ের উপর। তারপর চোয়াল শক্ত করে বলল, "আজ মানুষ শিকার করার মজা পাওয়া যাবে!"

সেংগেই পেমাংয়ের দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করল বুক চিতিয়ে। ওদিকে কেউ যেন তখন পেমাংয়ের কানে-কানে মন্ত্র পাঠের মতো করে বলছিল, "আজ লাল চাঁদ। লাল জ্যোৎস্না লেগে থাকবে উইলো গাছের পাতায়। ঠিক রক্তের মতো। তুমি তো সাহসী ছেলে পেমাং।"

সেংগেই শিকারির মতো এগিয়ে আসছিল। ওর মুখ দিয়ে লালা ঝরছিল শিকারের লোভে। পেমাং কোমর থেকে অ্যাকোনাইট মাখানো রুপোর ছোরাটা চকিতে বের করে সজোরে ছুড়ল কাছে এগিয়ে আসা সেংগেইয়ের বুকে।

পেমাং আর কিছু দেখতে পেল না। একটা আকাশ কাঁপানো আর্তনাদ শুনে সে চোখ বুজে ফেলেছিল। শুধু শিয়াক নদীর জলে ঝপাং করে ভারী কিছু পড়ার আওয়াজ শোনা গেল। পেমাংয়ের শরীর অবশ লাগছিল। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, পরিবেশে যেন বায়ু ফুরিয়ে আসছে। সে ব্রিজের উপর শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর একটা মিলিটারি জিপ তাকে দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে গেল তাদের মেডিক্যাল ইউনিটে।

অনেক রাতে পেমাংয়ের খোঁজ পেয়ে মিলিটারি ক্যাম্পে নিতে এল বাবা আর দাদা। পেমাং তাঁবুতে ফিরে যেতে-যেতে দেখল বরফশীতল ঠান্ডা রুপোর মতো জ্যোৎস্না সাজিয়ে দিয়েছে গোটা নুব্রা উপত্যকাকে। পেমাং ব্রিজের পাশের উইলো গাছটার দিকে তাকাল। এখানেই শেষবার সেংগেইকে দেখেছিল সে। না, পাতায় কোথাও কোনও রক্তের বিন্দু জমে নেই। রুপোলি জ্যোৎস্না চিকচিক করছে নদীর জলে। ছড়িয়ে পড়েছে গাছের পাতায়, বরফঢাকা পাহাড়চুড়োয়। পেমাংয়ের সব ভয় উধাও হয়ে গেল। সে তো দুর্বল নয়। লামা গিয়াসো তাকে সাহসী ছেলে বলেছেন।

দাদা বলল, "আমি বিছানা নিয়েছি, এই সুযোগে সেংগেইটা তোকে খুব বিরক্ত করছে শুনলাম। ডাক্তার বলেছে আমি ঠিক হয়ে গিয়েছি। এবার সেংগেই কিছু করলে খবর দিস তো। এমন শিক্ষা দেব না!"

"তার দরকার হবে না!" পেমাং নিচু গলায় কথাটা বলে দাদার হাত ধরে চলতে লাগল।

ছবি: কুনাল বর্মণ

বালী বঙ্গশিশু বালিকা বিদ্যালয়

লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলো, সংস্কৃতিচর্চাও চলে বালির এই স্কুলে। লিখেছেন সিজার বাগচী

এই স্কুলের নাম রেখেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শুধু নাম রাখাই নয়, ১৯২৭ সালে 'বালী জোড়া অশ্বত্থতলা বিদ্যালয়' থেকে যখন মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল হিসেবে 'বালী বঙ্গশিশু বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, নতুন স্কুলের জন্য রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদবাণীও লিখে দিয়েছিলেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বর্ণালী বসু বললেন, "আজও স্কুলের লাইব্রেরিতে আমরা ওই আশীর্বাদবাণী সংরক্ষণ করে রেখেছি। ওটা স্কুলের বিরাট সম্পদ।"

বালির এই স্কুল এলাকার শিক্ষার মান এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এই মুহূর্তে স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা বারশো। প্রধান শিক্ষিকা জানালেন, "এখানে শুধু বালির মেয়েরাই নয়, উত্তরপাড়া, বেলুড়, লিলুয়া, বেলানগর, ডানকুনি এবং আরও প্রত্যন্ত জায়গা থেকে মেয়েরা পড়তে আসে।" স্কুলে পা দিতেই সেটা বোঝা গেল। শীতকাল। ফলে স্পোর্টসের মরসুম। স্কুলের মাঠে জড়ো হয়েছে অনেক মেয়ে। স্পোর্টসের আগে প্রাথমিক বাছাই চলছে। ছোট মেয়েরা দৌড়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে, দৌড়চ্ছে। আর শিক্ষিকাদের নির্দেশে উঁচু ক্লাসের মেয়েরা ছোট মেয়েদের সামলাচ্ছে। আবার মূল বিল্ডিংয়ে পরের পর ক্লাস চলছে। এলাকায় বালী বঙ্গশিশু বালিকা বিদ্যালয়ের খুবই সুনাম। স্কুলের রেজাল্টও ভাল হয়। মাধ্যমিকে সব ছাত্রীই পাশ করে যায় প্রতি বছর।

লেখাপড়ার পাশাপাশি স্কুলের মেয়েদের খেলাধুলোর দিকেও নজর দেন শিক্ষিকারা। রাজ্যের বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ছাত্রীরা। সাঁতারে জাতীয় স্তরে ভাল ফল করেছে এই স্কুলের ছাত্রী রত্নাবলী পাঠক। এছাড়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাতেও তারা ভাল ফল করে থাকে।

ফোটো: সিজার বাগচী

যা হয়েছে

গত কয়েকদিনে পৃথিবী জুড়ে কী ঘটল আর আগামী পনেরোদিন সময়ে কী হতে চলেছে, তারই এক ঝলক রইল এই সংখ্যায়।

চ্যাম্পিয়ন ভারত

পাঁচ বছর পর আবার সাফ চ্যাম্পিয়নস কাপ জিতে নিল ভারতীয় ফুটবল দল। এই নিয়ে দশবারের মধ্যে সাতবার ভারত দক্ষিণ এশীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব জিতল। ত্রিবান্দ্রম আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে গতবারের চ্যাম্পিয়ন আফগানিস্থানকে ২-১ গোলে হারিয়ে দিল ভারত। আফগানিস্থানের জুবের আমিরি প্রথম গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। তারপর ভারতের হয়ে জেজে এবং সুনীল ছেত্রী দু'টি গোল করে ভারতের জয় নিশ্চিত করেন।

সেনাবাহিনী দিবস

ARMY DAY

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর ১৫ জানুয়ারি, ১৯৪৯ সালে প্রথমবার ভারতীয় সেনা প্রধানের পদ গ্রহণ করলেন একজন ভারতীয়। সেদিন লেফটেন্যান্ট জেনারেল কে এম কারিয়াপ্পা শেষ ব্রিটিশ কম্যান্ডার ইন চিফ জেনারেল স্যার ফ্রান্সিস বুচারের হাত থেকে এই দায়িত্ব বুঝে নিলেন। সেই কারণে এই দিনটিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এবছর ৬৮তম সেনাবাহিনী দিবস পালন করল ভারতীয় সেনাবাহিনী।

আবার মেসি

২০১৫ সালের 'বালঁ দি অর' পুরস্কার জিতে নিলেন লিওনেল মেসি। এই নিয়ে পঞ্চমবার ফিফার এই সম্মানীয় বর্ষসেরা ফুটবলারের খেতাব পেলেন এল এম টেন। গত দু' বছর এই পুরস্কার জিতেছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। গত বছর দেশের হয়ে কোপা আমেরিকা কাপ মেসি জিততে পারেননি ঠিকই। আর্জেন্তিনা ফাইনালে উঠলেও, বিশ্বকাপের মতো রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল মেসিকে। তবে বার্সেলোনার হয়ে গত মরসুমে মাঠে আগুন ঝরিয়েছেন তিনি। বিশ্ব ক্লাব কাপ সহ মোট পাঁচটি ট্রোফি জিতিয়েছেন দলকে। তাই রোনাল্ডো আর নেইমারকে পিছনে ফেলে, ২০১২ সালের পর আবার মেসিকেই বর্ষসেরা বেছে নিল ফুটবল দুনিয়া। বিশ্বসেরা মহিলা ফুটবলারের পুরস্কার পেলেন বিশ্বকাপজয়ী আমেরিকান দলের মিডফিল্ডার কার্লি লয়েড।

পঠানকোটে জঙ্গি হামলা

পঞ্জাব প্রদেশে সীমান্তের কাছে পাঠানকোটে ভারতীয় বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হামলা চালাল জঙ্গিরা। টানা তিনদিন জঙ্গিদের সঙ্গে ভারতীয় জওয়ানদের সংঘর্ষ হয়। শেষ পর্যন্ত ছ'জন জঙ্গি নিহত হয়। গুলির লড়াইয়ে সাতজন জওয়ান শহিদ হয়েছেন।

যুব দিবস

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন ১২ জানুয়ারি। দিনটি ভারত সরকারের উদ্যোগে দেশে জাতীয় যুব দিবস হিসেবে পালিত হল। ভারতের মতো দেশে যেখানে যুব সম্প্রদায় জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের মতো, সেখানে স্বামীজীর জীবন, তাঁর চিন্তা ভাবনায় দেশের যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে এই দিনটি মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

১৮ জানুয়ারি থেকে মেলবোর্ন পার্কে শুরু হয়েছে এবছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্ট অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। শেষ হবে ৩১ জানুয়ারি। নীল রঙের কৃত্রিম হার্ডকোর্টে এই টুর্নামেন্ট হয়। এবছর ১২৮ জন পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড় অংশ নিয়েছেন সিঙ্গলস বিভাগে। ডাবলসে পুরুষ ও মহিলা দলের সংখ্যা ৬৪টি। সেইসঙ্গে ৩২টি মিক্সড ডাবলস দল এই চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেবে। প্রসঙ্গত, গতবার নোভাক জকোভিচ ছেলেদের সিঙ্গলস এবং সেরেনা উইলিয়ামস মেয়েদের সিঙ্গলসে এই খেতাব জেতেন। মিক্সড ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ভারতের লিয়েন্ডার পেজ-মার্টিনা হিঙ্গিস জুটি।

নেতাজি জন্মদিবস

বর্তমান ওড়িশা রাজ্যের কটক শহরে ১৮৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেন। আই সি এস পরীক্ষায় পাশ করেও দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি। ভারতমাতার এই অমর সংগ্রামী সন্তানের জন্মদিনটি সাড়ম্বরে পালিত হবে গোটা দেশ জুড়ে।

প্রজাতন্ত্র দিবস

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি দেশ জুড়ে স্বাধীন ভারতের নিজস্ব সংবিধান কার্যকর হয়। সেই থেকে দিনটি প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে পালন করা হয়। দেশের রাজধানী শহর দিল্লিতে এবং প্রতিটি রাজ্যের রাজধানী শহর থেকে সাধারণ মহল্লায় এই দিনটি পালিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবলি দেওয়া শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই বছরও মর্যাদার সঙ্গে ৬৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হবে গোটা দেশে।

শহিদ দিবস

১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি বিকেলে, দিল্লিতে নিজের ঘর থেকে প্রার্থনা সভায় যাওয়ার পথে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছিলেন মহাত্মা গাঁধী। এই দিনটি তারপর থেকে সারা ভারত জুড়েই শহিদ দিবস হিসেবে পালিত হয়। এবছরও পরম শ্রদ্ধা এবং মর্যাদার সঙ্গে এই দিনটি গোটা দেশে পালিত হবে।
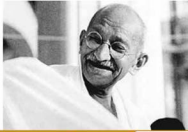
কলকাতা বইমেলা

২০১৬ সালের কলকাতা বইমেলা শুরু হচ্ছে ২৭ জানুয়ারি। চলবে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। কলকাতার বইপ্রেমিকদের এই ক'টা দিন কাটবে নতুন-নতুন বইয়ের সঙ্গে। মেলায় স্টলে-স্টলে ঘুরে বই দেখা, বই কেনা, গল্প, আড্ডায় মেতে উঠবে মিলন মেলা প্রাঙ্গন। এবারে বইমেলার থিম দেশ হল, 'বলিভিয়া'।

রাজ্য ফুটবল লিগের ফাইনাল

জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে রাজ্য ফুটবল লিগের ফাইনাল হতে চলেছে কলকাতায়। রাজ্যের ১৯ জেলার (হাওড়া বাদে) সেরা ক্লাবগুলোকে চারটি গ্রুপে ভাগ করে 'হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে' ভিত্তিতে এই টুর্নামেন্ট করছে আই এফ এ। জেলাস্তর থেকে ফুটবলার তুলে আনার লক্ষ্যে দু'বছর বন্ধ থাকার পর, এবছর আবার এই লিগ চালু করেছে আই এফ এ।

পর্যটন দিবস

পর্যটনকে জাতীয় আয়ের অন্যতম প্রধানক্ষেত্র হিসেবে তুলে ধরার লক্ষ্যে ২৫ জানুয়ারি দিনটি ভারতে পর্যটন দিবস হিসেবে পালিত হয়। পর্যটনের গুরুত্বের কথা সাধারণ মানুষকে বোঝাতে, আয়ের মাধ্যম, কর্মসংস্থান এই বিষয়গুলো তুলে ধরতে দিনটি পালিত হয়। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের পাশে দাঁড়িয়ে, তাঁদেরকে অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে সম্মান জানানোর মধ্যে দিয়েই যে পর্যটন ব্যবসা সফল হতে পারে এই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এই বছরও এই দিনটি পালিত হবে।

সাফ গেমস

দ্বাদশ সাফ গেমস শুরু হতে চলেছে ভারতের অসম এবং মেঘালয় রাজ্যে। যুগ্মভাবে এই দুই রাজ্যের দুই শহর গুয়াহাটি এবং শিলংয়ের ১৪টি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে এই গেমস অনুষ্ঠিত হবে বলে ঠিক রয়েছে। ২০১০ সালে ঢাকায় শেষবার সাফ গেমস অনুষ্ঠিত হয়। ঠিক ছিল, দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশকে নিয়ে গত বছর নভেম্বর মাসে ভারতে এই গেমস হবে। কিন্তু তা পিছতে-পিছতে আপাতত ফেব্রুয়ারির ৬ থেকে ১৬ তারিখ হবে বলে ঠিক রয়েছে। মোট ২৩টি খেলায় চার হাজার প্রতিযোগী এবারের সাফ গেমসে অংশ নেবেন। অসমের বিখ্যাত গন্ডার এই সাফ গেমসের ম্যাসকট নির্বাচিত হয়েছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'তিখর'।
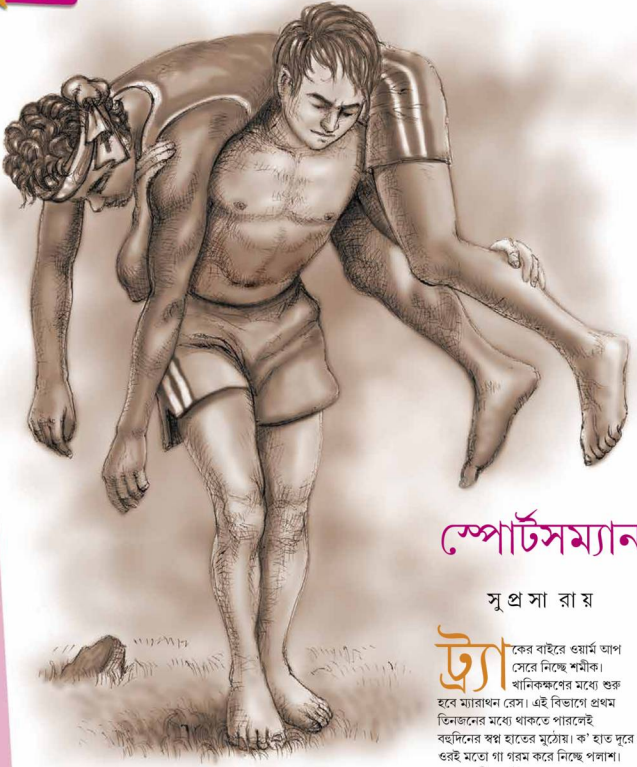
স্পোর্টসম্যান

সুপ্রসা রায়

ট্র্যাকের বাইরে ওয়ার্ম আপ সেরে নিচ্ছে শমীক। খানিকক্ষণের মধ্যে শুরু হবে ম্যারাথন রেস। এই বিভাগে প্রথম তিনজনের মধ্যে থাকতে পারলেই বহুদিনের স্বপ্ন হাতের মুঠোয়। ক' হাত দূরে ওরই মতো গা গরম করে নিচ্ছে পলাশ। চোখাচোখি হতেই হেসে বলল, "তোর চান্সই সবচেয়ে বেশি।"

হাত-পা নাড়তে নাড়তে শমীক বলে, "তা কেন? তোরা যে কেউ পেয়ে যেতে পারিস সুযোগটা।"

দূর থেকে অমিয়দা ডান হাত তুলে দু' আঙুলে বিজয় চিহ্ন দেখাচ্ছেন। অমিয়দা এই গ্রামেরই ছেলে। তবে এখন কলকাতায় থাকেন। রাজ্য ক্রীড়া দফতরের দায়িত্বপূর্ণ পদে আছেন। নিজেও সফল অ্যাথলিট। টানা চারবারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। এসব খবর দাদার কাছেই শুনেছে শমীক। মাসতিনেক আগে, একদিন কাজ থেকে ফিরে দাদা বলল, "সামনের রোববার তোকে একজনের কাছে নিয়ে যাব।" উত্তেজনায় দাদার চোখ চকচক করছিল।

"কার কাছে রে?"

"অমিয়দা।"

শুনেই লাফিয়ে উঠেছিল শমীক, "কলকাতা!"

"দূর বোকা, আরে ক'দিন হল অমিয়দা গ্রামে এসেছে। এবার অনেকদিন পরে এল রে।"

শমীক খুব ছেলেবেলায় অমিয়দাকে দেখেছে। খুব ভাল মনে নেই ওঁকে। বড় হয়ে যখনই ওঁর কথা শুনেছে, কল্পনায় এক পেশিবহুল যুবককে একমনে মাঠে দৌড়তে দেখেছে।

চনমনে গলায় দাদা বলল, "শুনলাম ভাল স্প্রিন্টার খুঁজতে এখানে এসেছে।"

"মানে?" শমীকের কৌতূহল বাড়ে।

"আমাদের আড়তে সবাই বলাবলি করছিল, অমিয়দা নাকি আশপাশের কয়েকটা গ্রামের অ্যাথলিটদের নিয়ে একটা কম্পিটিশন করাবে। তাতে যে চ্যাম্পিয়ন হবে, তাকে ও কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ভাল ট্রেনিং পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে।"

শুনতে-শুনতে স্বপ্ন ভাসতে শুরু করেছে শমীকের চোখে। উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে শরীর। কাঁপা গলায় ও বলে, "আমি ওই কম্পিটিশনে নাম দেব দাদা।"

"নিশ্চয়ই। তোকে তো সেই জন্যই নিয়ে যাব।"

পরের রবিবার সকাল-সকাল শমীককে অমিয়দার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল দাদা। আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে আরও অনেকে গিয়েছিল। তাদের অনেককেই শমীক চেনে। তবে তখন ওদের দিকে মন নেই ওর। ও তখন ঘরের দেওয়ালে টাঙানো অমিয়দার ছবিগুলো দেখছিল ঘুরে-ঘুরে। কোনওটায় দৌড়ে প্রথম হচ্ছেন, কোনওটায় ভিকট্রি স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে দু'হাত মাথার উপরে তুলে হাসছেন, নয়তো বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বা চ্যাম্পিয়ন ট্রোফি নিচ্ছেন। ফোটোগুলোর ভিতরে হারিয়ে গিয়েছিল শমীক। নিজেকে যেন অমিয়দার জায়গায় দেখতে পাচ্ছিল। হঠাৎ চাপা গলায় কয়েকজন একসঙ্গে ডেকে উঠল, "অমিয়দা!"

চমকে পিছনে তাকিয়ে শমীক মুগ্ধ। যেন পাথর কেটে গড়ে তোলা চমৎকার সুঠাম শরীর। ঠোঁটে স্বর্গীয় হাসি। দেখে মনে হয় একটা আলোর জ্যোতি যেন জ্বলজ্বল করছে ওঁর মাথার পিছনে। দৈব কণ্ঠে তিনি বলছেন, "এই চাকরিটা পাওয়ার পর থেকেই, আমার জেলার উঠতি প্লেয়ারদের জন্য কিছু করার তাগিদ বোধ করছি। আমি তো জানি, তোদের অনেকের মধ্যেই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সব রকম সম্ভাবনা আছে। দরকার শুধু একটা সুযোগের। আমি সেটাই দেব।"

নির্ধারিত দিনে শুরু হল প্রতিযোগিতা। প্রথমেই সবাইকে মাঠে ডেকে নিয়ে কিছু কথা বললেন অমিয়দা, "গ্রামের এই পরিকাঠামোয় তো ঠিকঠাক নিয়ম মানা সম্ভব নয়। তাই আমি তোদের যাতে সুবিধে হয়, তেমনভাবেই ইভেন্টগুলোকে সাজিয়েছি। প্রত্যেকে চারটে বিভাগে নাম দিতে পারবে। অন্তত তিনটে বিভাগের পয়েন্টের বিচারে যে সেরা হবে, সে কলকাতায় থেকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পাওয়ার সুযোগ পাবে।"

শুনতে-শুনতে শমীকের মনে হচ্ছে, অমিয়দা যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ হাতে হাজির হয়েছেন ওদের সামনে। যে ওঁর হাত থেকে প্রদীপ তুলে নিতে পারবে, তার জীবন ভরে থাকবে আলোয়।

নাম ডাকা শুরু হল। শেষবারের মতো হাত-পায়ের পেশিগুলোকে নেড়েচেড়ে স্বচ্ছন্দ করে নিয়ে দৌড়নোর জন্য প্রস্তুত প্রতিযোগীরা। নিজেদের ক্ষমতার শেষ বিন্দুও উজাড় করে দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

শমীকের শুরুটা চমৎকার হয়েছে। শরীরের সবক'টা পেশি দারুণ ঝরঝরে। ছুটতে-ছুটতে মাঠটাকে একবার চক্কর দিয়ে এক-এক করে মাঠের বাইরে বেরিয়ে গেল সবাই।

লেখাপড়ার চেয়ে খেলাধুলাই বেশি পছন্দ শমীকের। মাঠেঘাটে বড়দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্র্যাকটিস করে। আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতায় দু'বছর ধরে ও-ই চ্যাম্পিয়ন। তবে তাতে ওর তৃপ্তি নেই। ওর স্বপ্ন স্টেটমিট, ন্যাশনাল, এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ পার করে ছুঁয়ে ফেলে খেলার দুনিয়ার শিখর, অলিম্পিক। কল্পনায় বহুবার ভিকট্রি স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে সোনার মেডেল নিয়েছে ও। এমনকী, সেই সময় দেশের জাতীয় সঙ্গীতের সুরটাও স্পষ্ট শুনতে পায়। আর শমীকের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

শমীক ধরেই নিয়েছিল, কল্পনাই সার। ওর স্বপ্ন কোনওদিন সফল হওয়ার নয়। এসবরের জন্য যে পর্যায়ের প্রশিক্ষণ দরকার, তার খরচ জোগানোর ক্ষমতা ওর বাবার নেই। পাঁচ ভাইবোন, বাবা-মা। এতবড় সংসার চালাতেই বাবা হিমশিম। বছরকয়েক আগে ক্লাস এইটে পড়া দাদাকে স্কুল ছাড়িয়ে মহাজনের আড়তে ঢুকিয়েছেন। এবছর শমীকের বেলায় সেটা করতে যেতে দাদা রুখে দাঁড়িয়েছে। বাবার মুখের উপর জানিয়েছে, "শমু আমার মতো মহাজনের আড়তে কাজ

করবে না। লেখাপড়া করে, শহরের অফিসে চাকরি করবে।"

শমীক ভাবত, এত জোর কোথা থেকে পায় দাদা? শহরের অফিসে চাকরি করার যোগ্যতা ওর কই? এই প্রতিযোগিতার খবরটা পাওয়া পর্যন্ত ওর মনে একটা

আশার প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। এখানে চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে দাদার ইচ্ছেটাও পূরণ হয়। কলকাতায় গিয়ে শমীক ঠিক একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে পারবে।

দাদার মুখে অমিয়দার কথা শোনার পর থেকে শমীকের মনে একটা চাপা ভয় কাজ করছিল। এত বিরাট মাপের মানুষের কাছাকাছি তো ও কখনও যায়নি। তাই এঁরা কেমন হন, তাও ঠিক জানে না ও। তবে সেদিন অমিয়দাকে দেখে সব ভয় ফুৎকারে উড়ে গিয়ে ভাল লাগায় ভরে গিয়েছিল মনটা। প্রতিযোগিতার আলোচনার মধ্যেই অমিয়দা আলাদা করে সবার সঙ্গে কথা বলছিলেন। কে কী করে, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী। বাড়ির আর্থিক অবস্থা কেমন। খোঁজ নিয়েছেন সবকিছুর। বলেছেন, "ক্ষমতা থাকলে তোদের সবাইকে কলকাতায় নিয়ে যেতাম রে। তবে এই সুযোগটা না পেলেও, তোরা কিন্তু খেলাধুলো ছাড়িস না কখনও। একমাত্র খেলাই পারে কাউকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে।"

শমীকের মনে যেন বুস্টার ডোজের মতো কাজ করছিল কথাগুলো। তখনই অমিয়দাকে আদর্শ বানিয়ে ফেলেছিল। যখন খেলার দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে, সে-ও নিজের গ্রাম, জেলার উন্নতির জন্য কিছু করবে। প্রতিজ্ঞাটাকে বুকের ভিতর গেঁথে রেখেছে ও।

ক্রমশ গতি বাড়াচ্ছে শমীক। লক্ষ্য এগিয়ে আসছে। শরীর পালকের মতো হালকা। লম্বা-লম্বা পদক্ষেপে অনেকটা করে জায়গা পেরিয়ে যাচ্ছে। সামনে মাত্র একজন, অনন্ত ঢালি। আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতায় শমীকের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। ওকে পেরিয়ে যেতেই হবে। ম্যারাথন রেস শুরুর আগে দাদা

বলেছিল, "একশো আর দুশো, দুটোতেই তো কেল্লা মেরে দিয়েছিস রে শমু! ফার্স্ট তো হয়েছিসই। সময়ও কম লেগেছে। ওফ, অমিয়দা তোকে যে অফারটা দেবে, সেটা দেখার জন্যই অপেক্ষা করছি আমি।"

দাদার ঝলমলে মুখটা দেখতে-দেখতে শমীক শান্তভাবে জানিয়েছিল, "ভুলিস না, অন্তত আরও একটা ইভেন্টে ওরকম ফল করতে হবে। তারপর অফারের কথা।"

"ছাড় তো, তোর ধারেকাছে কেউ আছে নাকি?"

"আছে। অনন্ত ঢালি। লং জাম্পটা কেমন দিল দেখলি না? শুনলাম ওই লেংথটা নাকি ডিসট্রিক্ট রেকর্ড।"

শুনে দাদা থমকাল মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই পূর্ণ উৎসাহে বলল, "ছোঃ, একশো মিটারে তো একদম কেস খেয়ে গেল তোর কাছে। সেকেন্ড হলেও, তোর চেয়ে কতটা পিছনে ছিল বল তো? এবারে ও তোকে মেরে বেরিয়ে গেলেও প্রবলেম নেই। শুধু দেখিস, তোদের মাঝের ডিফারেন্সটা যেন কম থাকে।"

দাদা যতই বলুক, শমীককে ফার্স্টই হতে হবে। সেকেন্ড হতে মোটেও ভালবাসে না ও। তা ছাড়া সকলেই প্রাণপণে দৌড়চ্ছে। কে যে কখন ওকে টপকে যাবে...থার্ড হলেই কেঁচে যাবে সব। নাগালে চলে আসা সৌভাগ্যটাকে ফস্কে যেতে দেবে না শমীক।

অনন্ত আর সাত-আট গজ দূরে। ওকে হারাতেই হবে। হয়তো এটাই ওর সঙ্গে শমীকের শেষ প্রতিযোগিতা। এর পরেই শমীক এগিয়ে যাবে বহু দূর। অনন্তর ধরাছোঁয়ার বাইরে।

হাঁ করে বাতাস টানছে শমীক। বুকের ভিতর প্রচণ্ড চাপ। অনন্তও গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। পাল্লা দিয়ে তেজ বাড়াচ্ছে সূর্য। শমীকের গলার ভিতরটা মরুভূমি। শরীরে ঘামের বন্যা। কষ্ট যত বাড়ছে, ততই জোরালো হচ্ছে জেদটা। মাথার ভিতর কে যেন অনবরত বলে চলেছে, 'জোরে, আরও জোরে।'

হঠাৎ কীসে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল অনন্ত। সঙ্গে-সঙ্গে কপাল থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরতে শুরু করল। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল শমীক, "অনন্ত!" ততক্ষণে ও অনন্তকে পার করে চলে গিয়েছে ১০-১২ গজ। সেখান থেকে ফিরে এসে ওকে ধরে তুলতে চেষ্টা করল। বেচারা অনন্ত জ্ঞান হারিয়েছে।

সাধারণত, ম্যারাথন রেসে প্রতিযোগীদের সুবিধে-অসুবিধে দেখার জন্য কিছু লোক সঙ্গে-সঙ্গে থাকে। দর্শকরা তো থাকেই। কিন্তু এখানে কেউ নেই। অনন্তকে নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। তবে যদি কাউকে

পাওয়া যায়।

ইতিমধ্যে পিছনে থেকে অন্যেরা একে-একে পেরিয়ে যাচ্ছে ওদেরকে। দিশেহারা শমীক আকুল হয়ে ডাকল, "পলাশ, অমরেশ, হামিদ, আয় সবাই মিলে অনন্তকে ধরাধরি করে নিয়ে যাই। না হলে ওর অবস্থা আরও খারাপ হবে। ধুলোবালির মধ্যে পড়ে থাকলে সংক্রমণও হয়ে যেতে পারে।

পরপর আরও কয়েকজন বেরিয়ে গেল। কেউ সাড়া দিল না। অনন্ত জ্ঞান হারিয়েছে। শমীকও দৌড় থামিয়ে দিয়েছে। এই মুহূর্তে সামনে স্বপ্নপূরণের হাতছানি। এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে! গা থেকে গেঞ্জিটা খুলে অনন্তর ক্ষতস্থানে বেঁধে দিল শমীক। তারপর ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটতে শুরু করল। অনন্ত বেশ ভারী।

> দাদার মুখে অমিয়দার কথা শোনার পর থেকে শমীকের মনে একটা চাপা ভয় কাজ করছিল। এত বিরাট মাপের মানুষের কাছাকাছি তো ও কখনও যায়নি।

শমীকের শরীর যেন ভেঙে পড়তে চাইছে। পায়ের পেশিগুলো ডেলা পাকিয়ে গিয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণা। কিন্তু তাও মনে জোর এনে টলতে-টলতে এগোতে লাগল।

পলাশদের কাছ থেকে খবর পেয়ে স্ট্রেচার নিয়ে ছুটে এল কয়েকজন। তারা অনন্তকে কাঁধ থেকে তুলে নিতেই ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল শমীক।

দু'দিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারল না শমীক। তারপরের দিন বিকেলে পুরনো সাইকেলটা বের করে তেল দিতে-দিতে ভাবছিল, দাদার ইচ্ছেটা মাঠে মারা গেল। বাবা বলে দিয়েছেন, শমীকের এই খেলা নিয়ে পাগলামি আর সহ্য করবেন না। আর পড়তেও দেবেন না। একটা কাজও ঠিক করে ফেলেছেন ওর জন্য। শমীকের মন হু হু করে উঠল। কাজে ঢুকলে স্পোর্টস যে মাঠে মারা যাবে।

হঠাৎ ডাক শুনে পিছনে তাকাল শমীক। তাড়াতাড়ি হাত মুছে কাছে গিয়ে উদ্বিগ্নভাবে শুধোয়, "কেমন আছিস রে?"

ওর হাতদুটো ধরে অনন্ত বলে, "শুনেছি তুই সময়মতো তুলে না আনলে আমি হয়তো..."

শমীক অল্প হাসে, "ছাড় তো।"

"শমীক?"

"হুঁ?"

"তুই-ই ফার্স্ট হতিস। কলকাতায় যাওয়ার পথ খুলে যেত তোর সামনে। এতবড় সুযোগটা আমার জন্য হাতছাড়া করলি?" আবেগে থিরথির করে কাঁপে অনন্তর গলা।

উঠোনের কোণের পেয়ারা গাছটা থেকে স্পটজাম্প দিয়ে খানচারেক পেয়ারা পেড়ে এনে অনন্তকে দিয়ে শমীক বলে, "জানি, এমন সুযোগ আর পাব না। তবু এতে আমার দুঃখ নেই। আমার কাছে নিজের কেরিয়ারের চেয়ে একজন মানুষের জীবন অনেক বেশি মূল্যবান।"

সন্ধের আবছা আলোয় চুপ করে বসে রইল দু'জনে। ভবিষ্যতের কোনও পথের দেখা পাচ্ছে না ওরা। তবু সেই চেষ্টাতেই ডুবে থাকল। সময় বয়ে যেতে লাগল নিজের নিয়মে।

বাইবাই সাইকেল চালিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল অমিয়দার ভাই সুপ্রিয়। বুকে যেন হাপর চলছে। কেবল পরিশ্রমই নয়। একটা উত্তেজনাও জড়িয়ে রেখেছে ওকে। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, "শমীক, দাদা তোকেও কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে।"

অনন্ত চেঁচিয়ে উঠল, "কী করে জানলি?"

"একটু আগে দাদা ফোন করেছিল।"

আনন্দে শমীককে জড়িয়ে ধরল অনন্ত। শমীক যেন তখনও কথাটার মানে বুঝে উঠতে পারেনি। ফ্যালফ্যাল করে দেখছে সুপ্রিয়কে। ওর কাঁধদুটো ধরে ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে সুপ্রিয় বলল, "দাদা বলছিল, তুই যেভাবে রেস ছেড়ে অনন্তকে বাঁচালি দেখে দাদা খুব খুশি হয়েছে। বারবার বলছিল, 'চ্যাম্পিয়ন মানে তো কেবল সব ইভেন্টে মেডেল পাওয়াই নয়। স্পোর্টসম্যান স্পিরিট বলেও একটা কথা আছে। যেভাবে নিজের ভবিষ্যতের কথা না ভেবে কম্পিটিটরকে বাঁচাল, এখনই শমীকের জন্য কিছু করতে না পারলে এই প্রজন্মের প্লেয়ারদের মধ্যে থেকে এই স্পিরিটটাই হারিয়ে যাবে।'"

আকাশে উদয় হওয়া চাঁদটার মতোই উজ্জ্বল হয়ে উঠল শমীকের চোখ-মুখ। আনন্দে দুই বন্ধুকে জড়িয়ে ধরল ও, মনে-মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। যাক, দাদার স্বপ্নটা এবার সার্থক হবে। তারপরেই একটা দৃঢ় শপথকে ছড়িয়ে দিতে লাগল শরীরের কোষে-কোষে।

ছবি: দীপঙ্কর ভৌমিক

রঙিন পৃথিবী

রাজশ্রী বসু অধিকারী

দিদা গম্ভীরমুখে বসেছিল সোফায় হেলান দিয়ে। ধরে থাকা 'শরদিন্দু অমনিবাস'-এর মধ্যে ডান হাতের একটা আঙুল ঢোকানো। কপালে তিন-চারটে ভাঁজ। মুখে বিরক্তি। বেশ বোঝা যাচ্ছে অনেকক্ষণ সময়ের মধ্যে বইটা একটুও পড়া হয়নি। দিদার সামনে ওসিকাকু অপরাধীর মতো মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে। দরজা দিয়ে মাঝে-মাঝে উঁকি মেরেই সরে যাচ্ছে আরও দু'জন পুলিশের লোক। একটু আগে মামাই এ ঘরেই ছিল। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে এখন ভিতরে চলে গিয়েছে একটা জরুরি ফোন আসায়। সোনামামির বাপের বাড়ি থেকে ফোন। মামাইয়ের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে দিদার মুখটা আরও বেশি গম্ভীর হয়ে উঠেছে। পাটকুন ভাল করে জরিপ করে ঘরের ভিতরটা।

বেশ অনেকক্ষণ পর নড়েচড়ে বসে কথা বললেন দিদা, "একটা চোর ধরতে এত সময় লাগে? কী রকম পুলিশ বাবা তোমরা? এরকম কাজ করলে দেশ কি টিকবে?"

পাটকুন লক্ষ্মী ছেলের মতো চুপ করে এক কোণে বসে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যায়। ওসিকাকুটার মুখ প্রায় লজ্জায় নুয়ে পড়েছে। মাঝে-মাঝেই ভুঁড়ির সীমানার উপরে প্যান্টটাকে টেনে তোলার চেষ্টা করছেন। কিন্তু দৃশ্যমান পরস্পরবিরোধী আয়তনের জন্য ভুঁড়ি তার নিজস্ব জায়গায় অবিচল এবং প্যান্ট নেমে যেতে চাইছে নীচে। এই পুরো ব্যাপারটাই অত্যন্ত অস্বস্তিদায়ক, ভাবে পাটকুন। তার উপর দিদার বকুনি। বেচারা ওসিকাকু! গলাখাঁকারি দিয়ে উত্তর দেন, "একটা দিন সময় দেবেন মাসিমা। যে করেই হোক কাল সন্ধের মধ্যে আপনার সামনে চোর হাজির করব

তবে আমার নাম জগন্নাথ পাত্র।"

"থামো তুমি!" দিদা কালীপটকাসুলভ ভঙ্গিতে ধমক দেন, "এত বড় একটা পুলিশ অফিসার আমার ছেলে। তার বাড়িতেই কি না চুরি? ছি-ছি। সেজদি, রাঙাদা সবাই শুনলে বলবে কী? সোমু তো দেখছি ওয়েস্ট বেঙ্গলে পোস্টিং নিয়ে এসেই ভুল করেছে," ছেলে যে আই পি এস অফিসার সেই গর্ব দিদার ষোলোআনা। ওঁর বিশেষ একটা ধারণা আছে যে, দিল্লি বা মুম্বইয়ে পোস্টেড হলে মামাইয়ের গ্ল্যামারটা আরও বাড়ত। বেঙ্গল ক্যাডারটা দিদার কেন কে জানে বরাবর অপছন্দ। পাটকুনদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কারও আর সে কথা জানতে বাকি নেই। পান থেকে চুন খসলেই দিদার সেই অপছন্দটা বোঝা যায়। আর আজকে তো রাগ হওয়ার বিশেষ কারণই ঘটেছে।

স্বয়ং এ এস পি-র কোয়ার্টারে এ এস পি সাহেবের মায়ের ঘরের আলমারি থেকে তিনশো চল্লিশ টাকা বারো আনা চুরি। তাও আবার দিনে-দুপুরে।

মামাই ট্রেনিং কমপ্লিট করে মাত্র চার মাস হল শিলিগুড়ির এ এস পি হিসেবে জয়েন করেছে। দিদা আর সোনামামিকেও কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছে। এখানে বড় কোয়ার্টার। জায়গাটাও খুব ভাল। চারদিকেই পাহাড়, নদী, জঙ্গল। বেড়াতে পারলেই হল। পাটকুনের মা সোমালির এক মাত্র ভাই অর্থাৎ মামাই সোমশংকর। পাটকুন কালিম্পংয়ের কনভেন্টে পড়ে। এবার ক্লাস টেন। প্রায় অ্যাডাল্টই বলতে হবে। অন্তত ও নিজেকে তাই ভাবে। আই সি এস সি-র বেশি দেরি নেই। হঠাৎ করেই পাহাড়ে গন্ডগোল শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক কারণে স্কুলগুলো সব অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। বাবা-মা কলকাতায়। দু'জনেই ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। প্রথমে পাটকুনকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু রেজিস্ট্রেশন হয়ে গিয়েছে। এ বছরের জন্য আর কোথাও ভর্তি হওয়া যাবে না। দিলে কালিম্পং থেকেই পরীক্ষা দিতে হবে। সমানে মিটিং-মিছিল চলছে। যে-কোনও দিন স্কুল খুলেও যেতে পারে। সব দিক চিন্তা করে, মামাই সোনামামির সঙ্গে পরামর্শ করে বাবা-মা পাটকুনের আপাতত শিলিগুড়িতে থাকাই ঠিক করেছেন। সেই মতো দশ-বারোদিন কলকাতায় থেকে পাটকুন একা-একাই চলে এল কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি। যতদিন না স্কুল খোলে এখানেই থাকবে। মামাই আর সোনামামি মাকে অনেক করে বলার পর তবেই ওকে একা ছাড়া হয়েছে। কলকাতা থেকে ভাল করে পার্সেল করে এ সি টু টিয়ারে তুলে দিয়েছিলেন মা-বাবা। এন জে পি থেকে নামিয়ে নিয়েছে ওসি জগন্নাথ পাত্র। পরশুদিন সকালে স্টেশনে দেখা হওয়া মাত্রই তিনি ওসিকাকু হয়ে গিয়েছেন।

মামাই যতই বড়সাহেব হোক সেটা আর সবার কাছে। ঘরের মধ্যে দেখা হওয়া মাত্রই পাটকুনের সঙ্গে ছেলেবেলার মতো 'হাঁস ছিল সজারু ব্যাকরণ মানি না' দিয়ে শুরু করে ছিল। একা-একা ট্রেনজার্নি করে কলকাতা থেকে এন জে পি এসে পাটকুনের যতই নিজেকে অ্যাডাল্ট মনে হোক, মামাইয়ের খাকি ড্রেস পরা

রিভলভার নেওয়া চেহারাটার প্রতি অসীম আকর্ষণ। আকর্ষণ মামাইয়ের উপর, মামাইয়ের কাজ এবং কাজের জায়গার উপর। তাই এখানে আসামাত্রই মামাইকে ধরে পড়েছিল কোর্ট, থানা, জেল, লকআপ সব দেখবে বলে। মামাইও সঙ্গে-সঙ্গেই ওকে ওসি জগন্নাথ পাত্রর হাতে তুলে দিয়েছে।

সেই মতো আজ বেলা দশটায় পাটকুন থানা আর কোর্ট লকআপ দেখতে গিয়েছিল। থানায় যাওয়ার পর অনেকক্ষণ তো বসেই থাকতে হল। ওসিকাকুর কিছু কাজ ছিল। সেগুলো সারতে সময় লাগল। পাটকুন অবশ্য একটুও বোরড হয়নি। অন্য একজন অল্পবয়সি এস আই নয়ন শর্মার সঙ্গে বিশাল থানাবাড়ির সবটুকু ঘুরে-ঘুরে দেখেছে। মামাই ছিল না থানায়। মামাইয়ের চেম্বারটা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল ওকে। ওখানে বসিয়ে নয়ন শর্মা ওর জন্যই কোল্ড ড্রিঙ্কের অর্ডার দিতে বেরিয়েছিল। পাটকুন তো সেই ফাঁকে একবার টুক করে মামাইয়ের রিভলভিং চেয়ারটায় বসে বোঁ করে এক চক্কর ঘুরেও নিয়েছে। কী দারুণ আর কী বিশাল চেম্বার। সুন্দর করে সাজানো। সত্যি, চাকরি করতে হলে এই চাকরিটাই করতে হয়, যেখানে এরকম চেম্বার পাওয়া যাবে।

বেলা প্রায় একটা নাগাদ যখন ওরা থানা থেকে বেরিয়ে

কোর্টে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে, মামাই এয়ারপোর্টের কী যেন একটা স্পেশাল ডিউটি থেকে অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে ফোন করে বলল, "পাত্র, আপনি এখুনি একবার কোয়ার্টারে যান। ওখানে কিছু একটা প্রবলেম হয়েছে বোধ হয়। দেখুন। দেখে আমায় রিপোর্ট করুন। কুইক।"

ব্যস, পাটকুনকে নিয়ে কোর্টের বদলে ওসিকাকু সঙ্গে-সঙ্গে কোয়ার্টারে ফেরত এলেন। বাড়িতে ধুন্ধুমার কাণ্ড চলছে। পাঁচজন গার্ড, হোমগার্ড, সিকিওরিটিকে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিদা লেফ্‌ট অ্যান্ড রাইট ধমক দিচ্ছেন। পাটকুনরা ফেরামাত্রই ও সিকাকুও সেই দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন।

"কী করো কী তোমরা? এতজন থাকতে বাড়িতে চোর ঢোকে কী করে? সুবল, তোমার তো গেটের ডিউটি। বাইরের লোক ঢুকল কী করে অ্যাঁ?"

"মাসিমা, আমি তো গেটেই ছিলাম। কাউকে তো দেখি নাই," সুবল আমতা-আমতা করে উত্তর দেয়।

দিদা এবারে হোমগার্ড দু'জনের দিকে ফেরেন। অনেকক্ষণ ধরে চিৎকার-চেঁচামেচি করে দিদার ফরসা মুখ লাল হয়ে উঠেছে। চশমাটা খুলে নিয়ে এগিয়ে দেন ডান দিকে। দাঁড়িয়ে থাকা বৃদ্ধ নেপালি গার্ড কাঁধের তোয়ালে দিয়ে কাচদুটো মুছে পরিষ্কার করে দেয়। দিদা চশমাটা যথাস্থানে ধারণ করে আবার চেঁচাতে শুরু করেন। "তোমরা কীরকম গার্ড দাও তা বোঝা গেল। আমি কিছু শুনতে চাই না। কে ঢুকল, কী করে ঢুকল আমি জানতে চাই। আভভি। নেহি তো এক-এক করকে সব নিকাল যাও," প্রচণ্ড রেগে গিয়ে দিদা এবার হিন্দি বলতে শুরু করেছেন। পাটকুন প্রমাদ গোনেন। দিদার রাগ ওদের ফ্যামিলিতে একটা টাইফুন হিসেবে পরিচিত। খেপে গেলে সব লন্ডভন্ড করে দেবেন। তছনছ হয়ে যাবে সামনের মানুষ। এ সম্বন্ধে ওর সম্যক ধারণা আছে। কিন্তু সামনে দাঁড়ানো মানুষগুলো তো আর জানে না দিদার সম্বন্ধে। তারা একজন সত্তর বছর বয়সি বৃদ্ধার এই মেজাজ এবং ধমক-ধামকের ভারে একেবারে বিপর্যস্ত এবং হতচকিত। সাধারণত বৃদ্ধারা একটু শান্তশিষ্ট, চুপচাপ, নির্বিকারই হয়ে থাকেন। বয়সের ভারে ক্রমশ নুয়ে পড়ে তাদের সমস্ত জেদ, তেজ, গলার স্বরসপ্তক, মেজাজের গর্মি। কিন্তু দিদার কথা আলাদা। তিনি আই পি এস অফিসারের মা। চারখানা আই পি এসের সমান দিদার মেজাজ। জগন্নাথ পাত্রর মতো দুঁদে অফিসারের ক্ষমতা হয় না দিদার ছুড়ে চলা গুলি গোলার ফাঁক গলে আসল ঘটনাটা উদ্ধার করার। পাটকুন এগিয়ে আসে।

"কী হয়েছে দিদা? একটু খুলে বলো তো।"

"হ্যাঁ মাসিমা, দিদার, মানে ব্যাপারটা ডিটেলে না জানলে তো," জগন্নাথ পাত্র সুযোগ বুঝে কথা বলেন।

গোল ফ্রেমের চশমার ভিতর দিয়ে কঠিন চোখে একটু তাকান দিদা। তারপর থেমে-থেমে, কেশে-কেশে, আঁচলে মুখ চেপে-চেপে যা বলেন তার মর্মার্থ অনুধাবন করে পাটকুনও গম্ভীর হয়ে যায়।

বড় রাস্তার উপরে বিশাল লোহার গেটওয়ালা এ এস পি বাংলো। সেই গেট থেকে দু'পাশে লন ভেদ করে চওড়া মোরামের রাস্তা সোজা এসে থেমেছে বাংলোর বারান্দায়। বারান্দা থেকে ড্রয়িংরুম, লিভিংরুম, দিদার ঘর সব একেবারে সরলরেখায়, পরপর বসানো। দুপুরবেলা সোনামামি নিজের ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। দিদা সবেমাত্র তিনখানা খবরের কাগজ খুঁটিয়ে পড়া শেষ করে পিছন দিকের বাগানে লাউমাচা পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। দিদা দুপুরে কোনওদিনই ঘুমোন না। 'আরাম হারাম হ্যায়' নীতি নিয়ে সারা বাড়িতে খুটুরখুটুর কাজ খুঁজে বেড়ান। আজও চলছিল বাগান ভিজিট। খানিক পরে ঘরে এসে দেখেন আলমারির পাল্লা হাঁ করে খোলা। কখনওই দিদার চাবি লাগানোর অভ্যাস নেই। সবসময় চাবি ঝোলে আলমারির পাল্লায়। কিন্তু পাল্লাগুলো ভেজানো থাকে। এভাবে খোলা থাকে না। দিদা তো

তাকিয়েই বুঝেছেন ঘরে কোনও বাইরের লোক ঢুকেছিল। তারপরই হাঁকডাক করে খোঁজাখুজির পালা শুরু। দেখা গেল ঘরে বা আলমারিতে সব জিনিস ঠিকই আছে। শুধু আলমারির নীচের তাকে রাখা দিদার পুরনো পানের কৌটোটা মেঝের উপর খোলা পড়ে আছে। তার মধ্যে থেকে তিনশো চল্লিশ টাকা বারো আনা ভ্যানিশ। সেই থেকে সমানে চলছে দিদার হম্বিতম্বি গুলি-গোলা।

সবটা শুনে পাটকুন গম্ভীর হয়ে যায়। মামাইয়ের স্টাইলে দু'হাত পিছনে আটকে পায়চারি করে একটু। তারপর ডান হাতের তর্জনী বাঁ হাতের তালুতে ঠুকতে-ঠুকতে বলে "ওসিকাকু, আপনি সবাইকে আলাদা-আলাদা করে ডেকে স্টেটমেন্ট নিন। আমি রেকর্ড করছি। তারপর ওগুলো স্ক্যান করব আপনি আর আমি মিলে।"

স্টেটমেন্ট রেকর্ড, স্ক্যানিং এই শব্দগুলো আজকেই শিখেছে পাটকুন নয়ন শর্মার কাছে। এখন সুযোগ পেয়েই ঝালিয়ে নেয়। তারপর দিদার কাছে সরে এসে বলে, "তুমি ঘরে যাও দিদুন। তোমার চোর খুব শিগগির ধরা পড়ে যাবে।"

সন্দিগ্ধ চোখে জগন্নাথ পাত্রর দিকে তাকান দিদা। পাত্রও ততক্ষণে নব্বই ডিগ্রি ঘাড় হেলিয়ে দিয়েছেন।

দিদা ঘরে চলে যাওয়ার পর একে-একে গার্ড, হোমগার্ড, সিকিওরিটি মিলে পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলেন জগন্নাথ পাত্র। সবারই এক কথা। কাউকেই দেখেনি। দেড়তলায় কমন সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে তখন আড্ডা দিচ্ছিল দুই সিকিওরিটি গার্ড। দু'জনেই ছাপরা জেলার বাসিন্দা। দু'জন দু'জনকে তাদের বউ ছেলেমেয়ের গল্পস্বল্প করছিল। দরোয়ান রাস্তার ধারে গেটের কাছে বসে খইনি ডলছিল। হোমগার্ড দু'জনের একজন দোকানে গিয়েছিল দিদার পান কিনতে আর-একজন রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিল। কারও কাছ থেকেই গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বের করতে না পেরে যখন হতাশ জগন্নাথ পাত্র এক হাতে কপালের ঘাম মুছছে আর অন্য হাতে ধরে থাকা কলমের ঢাকনিটা চিবোচ্ছেন, এ রকম সময়ে কাছে এসে দাঁড়ায় আধময়লা টি-শার্ট আর প্যান্ট পরা একটি লোক। তাকে দেখেই চার্জড হয়ে ওঠেন জগন্নাথ। "কে? কী চাই এখানে?" জগঝম্প পুলিশি গলায় বলেন জগন্নাথ। পিছনেই সুবল দরোয়ান ছিল। বলে, "স্যার, এ হল পল্টন। পি ডব্লিউ ডি-র লোক।"

'পি ডব্লিউ ডি-র লোক দিয়ে কী হবে? ওরা তো রাস্তায় কাজ করছে,' মনে-মনে ভাবে পাটকুন। ও কিছু বলার আগেই আবার ওসিকাকুর বাজখাঁই গলা বেজে ওঠে, "আপনার কোনও দরকার আছে এখানে? রাস্তা বানাতে-বানাতে হুট বলতে সাহেবের বাংলোয় ঢুকে পড়লেন যে বড়?"

"হ্যাঁ স্যার, বলছি। ওই সুবলদা গেটের কাছে বলছিল বলেই শুনলাম। ভাবলাম, যাই, বলেই আসি। পরে ভুলে যেতে পারি। হে হে হে," লোকটার হে হে হে শুনে ভীষণ বিরক্ত হন ওসিকাকু। গম্ভীর মুখে বলেন, "কী বলতে চান বলে ফেলুন।"

"মানে স্যার, এই বাংলোয় একটা বাচ্চা ছেলে ঢুকেছিল বেশ কিছুক্ষণ আগে... ওই কাগজটাগজ কুড়োতেটুড়োতে হবে বোধ হয় হে হে।"

"বাচ্চা! হু-উ-উ-স," জগন্নাথ পাত্র দুই ঠোঁট ছুঁচলো করে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর জেরা করেন, "আপনি জানলেন কী করে? অ্যাঁ? এরা কেউ দেখল না।"

"এরা দেখেছে কিনা জানি না। তবে আমি স্যার দেখেছি গেটের ফাঁক দিয়ে। বারান্দার নীচটায় দাঁড়িয়েছিল হে হে।"

"কাকু, উনি বোধ হয় ঠিকই বলছেন। হতে পারে বাড়ির পিছন দিয়ে দেওয়াল টপকে ঢুকেছে। ওদিকটায় তো গার্ড ছিল না," পাটকুন বলে।

জগন্নাথ পাত্র দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়ান।

"বেশ। বাচ্চাটাকে দেখলে চিনতে পারবেন?" পল্টনকে বলে।

"হে হে স্যার এত দূর থেকে দেখা তো, তবে স্যার চেষ্টা করে দেখতে পারি। হে হে।"

"চুপ করুন। অকারণে হাসবেন না হে হে করে। ভেরি ব্যাড হ্যাবিট।"

বাড়িতে ধুন্ধুমার কাণ্ড চলছে। পাঁচ জন গার্ড, হোমগার্ড, সিকিওরিটিকে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিদা লেফ্‌ট অ্যান্ড রাইট ধমক দিচ্ছেন।

লোকটাকে থামিয়ে দিয়ে জগন্নাথ পাত্র সঙ্গের এ এস আইকে ডেকে নির্দেশ দেন, "বরুণ, এই লোকালিটির মাইনর ক্রিমিনালদের ফোটো অ্যালবামটা থানা থেকে নিয়ে আসবে এক ঘণ্টার মধ্যে। এনে এই লোকটাকে দেখাবে। যদি আইডেন্টিফাই করতে পারে তো আমাকে ফোন করবে।"

"আচ্ছা স্যার," বরুণ মাথা নাড়ে।

"আমাকে এবার কোর্টে যেতে হবে। চলো তোমাকে থানায় নামিয়ে দিয়ে যাই," বরুণকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে-যেতে বলেন জগন্নাথ পাত্র।

"কাকু," পাটকুন পিছন থেকে ডাকে, "দিদাকে কী বলব? চোর বিকেলে ধরা হবে?"

(ক্রমশ)

ছবি: প্রত্যয়ভাস্বর জানা

নেতাজিকে নিয়ে কুইজ়

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আমাদের জাতীয় নায়ক। তাই ২৩ জানুয়ারি তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে আনন্দমেলার ওয়েবসাইট www.anandamela.in-এ এক কুইজ় প্রতিযোগিতা করা হচ্ছে। তোমরা যারা দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ো তারা সবাই এই কুইজে অংশগ্রহণ করতে পার। ওয়েবসাইটে গিয়ে নেতাজিকে নিয়ে করা প্রশ্নগুলো দেখো তারপর প্রশ্নের উত্তরগুলো ২৭ জানুয়ারি ২০১৬-র মধ্যে মেল করো আনন্দমেলার মেল আইডি anandamela-magazine@gmail.com-এ। প্রথম তিনজন সঠিক উত্তরদাতার জন্য থাকবে আকর্ষণীয় পুরস্কার। আর প্রথম দশজন সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে আনন্দমেলার ওয়েবসাইটে। অতএব আর দেরি না করে চটপট মেল করে উত্তর পাঠাতে শুরু করো।

পিরামিডের রহস্যদরজা

পত্রলেখা নাথ

এই নিয়ে তিনবার গিজ়া পিরামিডে ঢুকেছে রাফায়েল, তবু পিরামিডের দরজার সামনে দাঁড়ালে এখনও ভিতরের নকশাটা কেমন গুলিয়ে যায়।

"গিজ়া পিরামিডে প্রবেশপথ সম্ভবত প্রথম আবিষ্কার করেন আল-মামুন ও তার পুত্র হারুন অল রশিদ। আসল প্রবেশপথটা যদিও ছিল তার কিছুটা উপরে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ডিক্সন প্রথম

লক্ষ করেন পিরামিডের ভিতর কুইন্স চেম্বারের তলায় আরও একটা সিক্রেট চেম্বার রয়েছে। কিন্তু ডিক্সন ও তাঁর বন্ধু জেমস গ্র্যান্ট দক্ষিণের সিক্রেট চেম্বারটি নিয়ে গবেষণা শুরু করলেও সে কাজ বেশি দূর এগোয় না। এর পর ১৯৯৩ সালে, ২০০১ সালে বারবার এই গিজ়া পিরামিডের গুপ্ত দরজাটা খোলার চেষ্টা হয়েছে। দক্ষিণের এই গোপন দরজার সামনে বিস্ফোরণও ঘটানো হয়েছে, কিন্তু দরজাটি খোলা সম্ভব হয়নি। দরজার আড়ালে যে কী রয়েছে, তা এতদিন কেউ জানতে পারেনি। অবশেষে ২০১২ সালে গিজ়া পিরামিড বিশেষজ্ঞ ডঃ হাওয়াস ও মিঃ রাডক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে হংকং ইউনিভার্সিটির ও সুকুটেক নামক ব্রিটিশ কোম্পানির যৌথ উদ্যোগে মিঃ ওয়াইট হেডের তত্ত্বাবধানে স্নেক ক্যামেরার সাহায্যে সিক্রেট ঘরের ভিতরের একটা ফোটো তোলা সম্ভব হয়। দেখা যায় ফাঁকা ঘরটির দেওয়ালে কিছু দুর্বোধ্য হায়রোগ্লিফিক্স্ ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু এই ঘরটির ফোটো পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে নতুন আরও একটি রহস্য সামনে এসে দাঁড়ায়। দরজার পিছনে রয়েছে দ্বিতীয় গোপন দরজা। কিন্তু সে রাস্তা কোথায় গিয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি। রহস্য এখনও রয়েই গিয়েছে, বুঝলে জনি!"

জিপে আসতে-আসতে রাফায়েলের কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিলেন জনি। এই প্রথম মিশরে এসেছে। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি গিজ়া পিরামিড। এতদিন বইয়ের পাতায়, ফোটোয় দেখেছে। আজ সেই পিরামিডের ভিতর প্রবেশ করবে। ভাবতেই রোমাঞ্চ লাগে জনির। এক নিশ্বাসে কথা বলছিলেন রাফায়েল, কথা থামতেই জনি বলে ওঠেন, "তবে সে রহস্যের জট আমাদের হাতেই খুলবে, কী বলো রাফায়েল?"

রাফায়েল একবার জনির দিকে তাকান। তারপর বলেন, "তুমি এর আগে গিজ়া পিরামিডে এসেছ?"

জনি মাথা নাড়েন, বলেন, "না, আমি এতদিন ব্রিটিশ মিউজ়িয়ামের অন্য একটা প্রোজেক্টে আমেরিকায় ছিলাম। স্যার ওয়াইট হেডের সঙ্গে মিউজ়িয়ামেই পরিচয়। ওঁর সঙ্গে এর আগেও আমি দু'বার ডকুমেন্টেশনের কাজ করেছি। তবে ইজিপ্টে এই প্রথম। প্রোজেক্ট জয়েন করার আগে গিজ়া পিরামিড সম্পর্কে কিছু লেখাপড়া করেছি। যেমন, ২৬০০ খ্রিস্টপূর্বে মিশরের রাজা খুফুর রাজত্বকালে এটি গড়ে উঠেছিল। আড়াই মিলিয়ন ব্লক লাইমস্টোন দিয়ে তৈরি এই পিরামিডটি পৃথিবীর ১৩ একর জায়গা জুড়ে রয়েছে। এর উচ্চতা ৪৫৪ ফিট ছিল, এখন অবশ্য উচ্চতা খানিকটা কমেছে। তাও প্রায় ৪৫ তলার মতো হবে।"

"বাবা, অনেক লেখাপড়া করেছ দেখছি।" রাফায়েলের কথায় জনি হেসে ফেলেন।

কথা বলতে-বলতে জিপ এসে পৌঁছয় গিজ়া পিরামিডের কাছে। কায়রো থেকে দশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত গিজ়া পিরামিড। জিপে আসতে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বেশি লাগে না। জিপটা বেশ খানিকটা দূরে ছেড়ে দেন জনি, রাফায়েল। তারপর হাঁটতে-হাঁটতে এগিয়ে যান গিজ়া পিরামিডের দিকে। সামনের পিচের রাস্তাটা বাঁক নিয়ে অন্য দিকে চলে গিয়েছে। তারই পাশে পরপর তিনটে পিরামিড নির্দিষ্ট কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রাফায়েল ডিসুজা আর জনি হাডসন ব্রিটিশ মিউজ়িয়ামের রিসার্চ টিমের নির্দেশে আমেরিকা থেকে ইজিপ্টে এসেছেন। রাফায়েল, স্যার ওয়াইটহেডের বিশ্বাসযোগ্য এবং সহকারী। স্যার নিজেই মিশরের অন্টিকুয়েটিস কমিশন থেকে পিরামিডে ঢোকার পারমিশন করিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু নিজে আসেননি। ওয়াইটহেড নিজে এক্সপিডিশন টিম নিয়ে এলে সারা পৃথিবীর গবেষক ও মিডিয়ার নজর পড়বে এদিকে, তাতে আগের বারের মতো নানা সমস্যার সৃষ্টি হবে।

॥ ২ ॥

রাফায়েল ও জনি হাঁটতে-হাঁটতে এসে দাঁড়ান পিরামিডের দরজার সামনে। সঙ্গে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, জলের বোতল আর স্নেক ক্যামেরা। স্যারের কাছ থেকে পিরামিডের ম্যাপটা ভাল করে বুঝে নিয়েছেন রাফায়েল। তবু ভিতরে ঢোকার আগে আর-একবার ম্যাপটায় চোখ বুলিয়ে নেন। ঘড়িতে সকাল দশটা। প্রথমে রাফায়েল মাথাটা নিচু করে গহ্বরে প্রবেশ করে। এখন পথটা অনেক আধুনিক হয়েছে। ছোট-ছোট প্লেটের মতো পাটাতন দিয়ে সিঁড়ির ব্যবস্থা হয়েছে, সাইডে হাতলও রয়েছে। নামতে খুব অসুবিধে হয় না। রাফায়েল তরতর করে নীচে নামতে থাকেন। পিছনে জনি। চোখ ধাতস্থ হতে একটু সময় নেয়। বাইরে সূর্যের আলো, ভিতরেও আলোর ব্যবস্থা রয়েছে, কোথাও হলুদ রঙের হালকা-হালকা আলো, কোথাও আবার টিউব লাইট, কোথাও বা সম্পূর্ণ অন্ধকার, সব মিলিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। রাফায়েলের এই পথটা মোটামুটি চেনা। তবু মনে-মনে একবার ম্যাপটা ঝালিয়ে নেন। দু'পাশে পাথরের দেওয়াল, একজন মানুষ কোনওমতে মাথা নিচু করে নামতে পারে। কিছুটা এগিয়ে রাফায়েল দাঁড়িয়ে পড়েন, তারপর জনিকে বলেন, "দেখো,
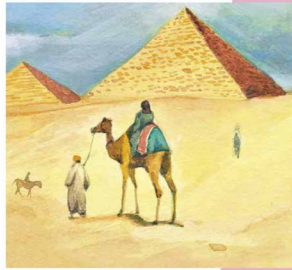
ডান দিকে একটা রাস্তা ঢুকেছে, এটা দিয়ে সোজা গেলে প্রথমে পড়বে গ্র্যান্ড গ্যালারি, তারপর কিংস চেম্বার যেখানে রয়েছে মিশরের রাজা খুফুর সমাধি, তার একটু নীচে কুইন্স চেম্বার, সেখানে খুফুর রানিদের সমাধি। আমরা ওদিকটায় যাব

না। এই রাস্তা ধরেই সোজা মাটির বেশ খানিকটা গভীরে পৌঁছে যাব আমরা, যেখানে রয়েছে সেই সিক্রেট ডোর। কী জনি, তোমার ভয় করছে?"

ভিতরে ঢোকার পর থেকেই জনির কেমন একটা অস্বস্তি লাগছে, একে আলো-আঁধারি পথ, তার উপর মাথা নিচু করে কোনওমতে যেতে হচ্ছে, সঙ্গে রয়েছে দামি ক্যামেরা। জনি কোনও উত্তর দেন না।

রাস্তাটা সোজা মাটির গভীরে নেমে গিয়েছে। পথের কোথাও-কোথাও আলোর ব্যবস্থা রয়েছে। রাফায়েল তবু টর্চটা অন করেই এগোন। নিজেদের কথা এত ইকো হতে থাকে, অনেকসময় রাফায়েলের কথা জনি ঠিকমতো শুনতে পান না। পোর্টেবেল ক্যামেরার ব্যাগটা মাঝে-মাঝে দেওয়ালে আটকে যায়। রাফায়েল দ্যাখেন, জনি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে।

"কী হল জনি? শরীর খারাপ লাগছে?" রাফায়েলের শরীরও ঘামে ভিজে গিয়েছে। কিন্তু জনি দরদর করে ঘামছেন। রাফায়েল বলেন, "জনি কোনওমতে আর-একটু এসো, পথটা শেষ করতে পারলেই একটা ঘরের মতো জায়গা পাব, যেখানে একটু কোমর সোজা করে দাঁড়নো যাবে।"

কিন্তু জনি এগোতে পারেন না। শরীর যেন ছেড়ে দিয়েছে, ক্যামেরার ব্যাগটা নামিয়ে উবু হয়ে বসে পড়েন। মিনিটপাঁচেক পর আস্তে-আস্তে রাফায়েলের দেখানো পথে এগোন জনি। ঠিকই, রাস্তা শেষে একটা হল ঘর। টিউবের আলোও রয়েছে। জনি সোজা হয়ে দাঁড়ান।

রাফায়েলকে বলেন, "রাফায়েল আমার মনে হচ্ছে, আমাদের পিছন-পিছন কেউ আসছে। আমি ফিল করতে পারছি, তার হুস হুস নিশ্বাসের শব্দ ও জুতোর আওয়াজ।"

রাফায়েল হাসেন, বলেন, "তুমি কি আবার মমির অভিশাপে বিশ্বাস করো নাকি?"

জনির মুখ তখন ভয়ে ছোট হয়ে গিয়েছে, গলা শুকিয়ে উঠেছে। এক বোতল জল গলায় ঢালতে-ঢালতে বলেন, "বিশ্বাস করো, কেউ যেন আমার একদম কানের কাছে নিশ্বাস ফেলছিল। আমি দু'বার পিছন ফিরে দেখেছি, কাউকে দেখতে পাইনি।"

রাফায়েল দেখলেন জনি যদি ভয় পেয়ে যান, আসল কাজটাই হবে না।

রাফায়েল বলেন, "পিরামিডটা সাড়ে চার হাজার বছর আগে এমন টেকনোলজিতে তৈরি হয়েছিল জনি, যেখানে এক দেওয়ালে কথা বললে পিরামিডের সব দেওয়ালে কান পাতলে

ড্রিল হবার পর দু'জনে ধপ করে মেঝেয় বসে পড়ে। রাফায়েলের মনে হয়, আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আসলে বুদ্ধিমানের কাজ হত। মাথাটা যেন ঠিক কাজ করছে না। শরীর এত ক্লান্ত লাগছে।

সে কথা শোনা যায়। দেখো, এই যে আমি চিৎকার করে কথা বলছি, বা হুম করে শব্দ করছি, কীরকম শোনাচ্ছে?"

জনি দেখেন সত্যিই দেওয়ালে-দেওয়ালে আওয়াজটা এমন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, যেন অনেক মানুষ একসঙ্গে কথা বলছেন বা শব্দ করছেন। রাফায়েল বলে, "ওই শব্দটা আসলে আমার আর তোমার জুতো ও নিশ্বাসের শব্দ।"

॥ ৩ ॥

জনি একটু ধাতস্থ হন। কিন্তু মাটির নীচে প্রায় আড়াইশো ফিট আসার কারণে গুমট বেড়েই চলেছে।

জনি বলেন, "এখানে আর বেশি সময় থাকা যাবে না রাফায়েল, তাড়াতাড়ি কাজ সারো।"

রাফায়েল জানেন, এটা ডিসেন্ডিং প্যাসেজ, এর পর ডেড লাইন। এদিক দিয়ে বেরোবার কোনও পথ নেই। বেরোতে হবে সেই একই রাস্তা ধরে, যেদিক দিয়ে পিরামিডে প্রবেশ করেছে।

রাফায়েল দেখেন সামনের রাস্তা আরও গভীর মাটির নীচে চলে গিয়েছে। কিন্তু সে জায়গা এত ছোট যে মানুষ ঢুকতে পারে না। রাফায়েল ম্যাপটা বের করে দেখেন, হ্যাঁ, এটাই তাঁদের গন্তব্য। ২০১২ সালে এখান থেকেই সিক্রেট দরজাটাকে ড্রিল মেশিন দিয়ে গর্ত করে স্নেক ক্যামেরার মাথাটা প্রবেশ করানো হয়েছিল। এবার স্নেক ক্যামেরার লেন্সটাকে আরও বাড়ানো হয়েছে যাতে পিছনে থাকা দ্বিতীয় হিডেন দরজা পর্যন্ত পৌঁছনো যায়। জনি পোর্টেবল ক্যামেরাটা মেঝেয় নামান, তারপর ড্রিল মেশিনটা বের করেন। মেশিনের মাথাটা সরু কিন্তু ভীষণ পাওয়ারফুল। রাফায়েল গতবারের মতো ড্রিল মেশিনটা দিয়ে প্রথম দরজাটা ভেদ করে দ্বিতীয় দরজা পর্যন্ত পৌঁছন। চু শব্দ করে ড্রিলের কাজ শুরু হয়। পাথরের দরজা কাটায় ধুলো ও পাথরের গুঁড়ো বাইরে আসতে থাকে। আলো ফেলে রাফায়েল দ্যাখে সামান্য একটু গর্ত হয়েছে মাত্র। আবার চেষ্টা করে রাফায়েল। ঘণ্টাতিনেকের চেষ্টায় একটা গর্ত হয়।

জনি বলেন, "খুব বেশি দরকার নেই, শুধু দেখো স্নেক ক্যামেরার মাথাটা যেন ঠিকমতো প্রবেশ করানো যায়।

গুমট ক্রমশ বাড়তে থাকে। জনির ইচ্ছে করছে দৌড়ে বাইরে চলে যেতে, খোলা আকাশের নীচে বুক ভরে নিশ্বাস নিতে। কিন্তু পিরামিডের ভিতর ঢোকা যতখানি কষ্টকর, বেরনো ততটাই কঠিন। একইরকমভাবে মাথা নিচু করে আস্তে-আস্তে বেরতে হবে।

ড্রিল হওয়ার পর দু'জনে ধপ করে মেঝেয় বসে পড়েন। রাফায়েলের মনে হয়, আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে এলে বুদ্ধিমানের কাজ হত। মাথাটা যেন ঠিক কাজ করছে না। শরীর এত ক্লান্ত লাগছে। পিরামিডের ভিতরে ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়। জনি লাফ দিয়ে মেঝে থেকে উঠে পড়েন। বলেন, "আর বেশিক্ষণ এখানে থাকলে মারা যাব রাফায়েল। যা করার শিগগির সারতে হবে।"

ব্যাগ থেকে পোর্টেবল স্নেক

ক্যামেরাটা খোলেন জনি। তারপর ক্যামেরার ছোট্ট স্ক্রিনটা রাফায়েলের সামনে রেখে ক্যামেরার লম্বা মাথাটা আস্তে-আস্তে আরও লম্বা করেন। রাফায়েল স্ক্রিনে দেখে নির্দেশ দিতে থাকেন, "হ্যাঁ জনি, আরও একটু এগোও, জনি ক্যামেরাটা বেশি কাত করে ফেলেছ, স্ক্রিনটা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।"

॥ ৪ ॥

রাফায়েলের নির্দেশমতো জনি ধীরে-ধীরে লম্বা স্নেক ক্যামেরার মাথাটা প্রথমবার দরজার ছোট্ট অংশটা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দ্বিতীয় দরজা পর্যন্ত লাগান। স্ক্রিনে রাফায়েল দেখেন দুটো হাতলওয়ালা কড়া লাগানো রয়েছে। দরজার গায়ে যেন কড়া নেড়ে কাউকে জাগিয়ে তোলার অপেক্ষা।

রাফায়েল বলেন, "জনি ভাল করে আলো ফেলো জায়গাটায়।"

আলো ফেলতেই আবার দেখা যায়, দরজার সামনে লোহার দুটো কড়ার মতো। ক্যামেরাটা আরও একটু এগিয়ে যায়, তারপর আরও একটু। ড্রিল মেশিন দিয়ে করা গর্তটার মধ্যে ক্যামেরার মাথাটা প্রবেশ করান জনি। স্ক্রিনে অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখা যায় না।

রাফায়েল বলেন, "জনি, কোনওভাবে ক্যামেরার আলোটা কি বাড়ানো যায়?"

পিছন থেকে ক্যামেরার মেনুবার খুলে অ্যাপারচারটা বাড়ান জনি। ক্যামেরার লেন্সটা অটোমেটিক ঘুরে-ঘুরে ঘরের মধ্যের ফোটো তোলার চেষ্টা করে। রাফায়েলের সামনের স্ক্রিনে শুধু আলো-আঁধারিতে অন্ধকার ছায়া। হঠাৎ মনে হয় কী যেন একটা স্ক্রিনে এসেই সরে গেল।

রাফায়েল চিৎকার করে বলেন, "জনি, ক্যামেরাটা কি ম্যানুয়ালি অপারেট করা যাবে?"

জনি মেনুবার খুলে হাতে করে ক্যামেরার লেন্সের ডাইমেনশন ডিগ্রি লিখে এন্টার করেন। ক্যামেরার মাথাটা ম্যানুয়ালি অপারেট হয়। রাফায়েল আবার বলেন, "ম্যানুয়ালি ঘরের পুরোটা কভার করার চেষ্টা করো জনি, কিছু একটা আছে দেওয়ালের গায়ে।"

জনি বারপাঁচেক ডাইমেনশন চেঞ্জ করে ক্যামেরাটাকে পুরো ঘরটায় প্যান করান।

হঠাৎ রাফায়েল বলেন, "জনি স্টপ-স্টপ।"

রাফায়েলের সামনে স্ক্রিনে ভেসে উঠেছে কিছু পিকটোরিয়াল লিপি। রাফায়েল জানেন এগুলো হায়রোগ্লিফিক লিপি। প্রাচীন মিশরে এই হায়রোগ্লিফিক ব্যবহৃত হত। দীর্ঘদিন ধরে পিরামিড সংক্রান্ত কাজে স্যারকে সহযোগিতা করায় এই লিপির কিছুটা পড়তে পারেন দুর্বোধ্য মনে হয়।

"এই রাস্তা তোমায় পৌঁছে দেবে এক নতুন জীবনে।

মৃত্যুর পর খুঁজে পাবে এই নতুন জীবন।

ভয় কী? এগিয়ে এসো।

কড়া নেড়ে জাগিয়ে তোলো মৃত্যুর রানিকে।"

হঠাৎ স্ক্রিনটা অন্ধকার হয়ে যায়।

উত্তেজিত কণ্ঠে রাফায়েল বলেন, "জনি, ক্যামেরাটা অফ হয়ে গেল কেন?"

রাফায়েল।

চিৎকার করে জনিকে বলেন, "ক্যামেরাটা একইভাবে রাখো নাড়িও না।"

স্ক্রিনে ফুটে ওঠে হায়রোগ্লিফিক লিপি। রাফায়েলের গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। একটু-একটু করে বোঝার চেষ্টা করে রাফায়েল, কিছু বুঝতে পারেন, কিছু

কোনও উত্তর আসে না। রাফায়েল আবার চিৎকার করে ওঠেন, "জনি।"

এবারেও কোনও উত্তর আসে না, রাফায়েল এগিয়ে যান। দ্যাখেন, জনি সেন্সলেস হয়ে গিয়েছেন। বোতল থেকে জল জনির মুখে, চোখে দিতে, জনি চোখ খোলেন।

রাফায়েল বলেন, "গরমে ক্লান্তিতে,

অক্সিজেনের অভাবে তুমি বোধ হয় সেন্স হারিয়েছিলে জনি। এখন ঠিক আছ?"

জনি ধড়মড় করে উঠে বসে, ক্যামেরাটা অফ হয়ে গিয়েছে। ক্যামেরাটা অন করার চেষ্টা করে। একবার অন হয়ে আবার অফ হয়ে যায়। তারপর আর চালু করা সম্ভব হয় না। ক্যামেরার লেন্স গুটিয়ে এনে দেখে কালো ছাইয়ের মতো কিছু একটায় লেন্সটা ভরে গিয়েছে। জনি, রাফায়েলের দিকে তাকিয়ে বলেন, "এই ক্যামেরা দিয়ে আর বোধ হয় কোনও কাজ হবে না রাফায়েল। চলো, এখান থেকে বেরিয়ে পড়া যাক। কেন জানি না মনে হচ্ছে এখানে থাকাটা নিরাপদ নয়। ক্যামেরাটা তো কাজ করছে না, তা ছাড়া আমার আর বয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। আপাতত এটা এখানেই থাক। পরে দেখা যাবে। আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে। ক্যামেরায় লেগে থাকা ছাইয়ের মতো জিনিসটার কী বিশ্রী গন্ধ, আমার গা-টা গুলোচ্ছে, আমি আর-এক মুহূর্ত এখানে থাকতে চাই না। চলো, আর দেরি নয়।"

কথাটা বলেই জনি হনহন করে নিচু প্যাসেজটার দিকে এগিয়ে যান। মাথাটা নিচু করে টানেলের রাস্তা দিয়ে এগোতে শুরু করেন। একটু পরেই মনে হয়, পিছনে তো রাফায়েল নেই, রাফায়েল কোথায় গেল! জনি আবার ফিরে যান।

॥ ৫ ॥

রাফায়েল তখন উবু হয়ে বসে ক্যামেরারটাকে পাগলের মতো অন করার চেষ্টা করছেন আর মাঝে-মাঝে একটা চক দিয়ে মেঝেয় কিছুর ছবি আঁকছেন। জনি রাফায়েলকে দেখে অবাক হন। রাফায়েলের হাতটা ধরে জনি চিৎকার করেন, "কী করছ রাফায়েল? চলো।"

রাফায়েল হাতটা ছাড়িয়ে নেন, বলেন, "দাঁড়াও জনি, স্ক্রিনে মিনিটখানেকের জন্য হায়রোগ্লিফিক লিপিগুলো দেখেছি, সেগুলো যদি ঠিক-ঠিক মনে করে লিখতে পারি তা হলেও তো একটা ডকুমেন্টেশন থাকবে। ক্যামেরাটা তো মনে হয় আর চলবে না। তবু দেখছি যদি একটু সময়ের জন্য অন করা যায়," কথা বলতে-বলতে কাশতে শুরু করেন রাফায়েল।

"কতক্ষণ এভাবে তুমি চেষ্টা করবে রাফায়েল? তোমারও তো শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। এর পর তো দমবন্ধ হয়ে মারা যাবে। আমি তোমায় রিকোয়েস্ট করছি, এখন বেরিয়ে চলো।"

রাফায়েল তখন মন দিয়ে মেঝেয় কী সব লিখে চলেছেন, জনির দিকে না

> জনির শরীর ধীরে-ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসছে। বুঝতে পারেন, আর বেশিক্ষণ থাকলে ও আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন। কিন্তু রাফায়েল এরকম করছে কেন! এতখানি বদলে গেল রাফায়েল!

তাকিয়ে মাথা নিচু করেই বলে, "ওই দ্বিতীয় সিক্রেট চেম্বারের দরজা মৃত্যু পরবর্তী জীবনের পথ দেখাতে পারে। একবার যদি ওই হায়রোগ্লিফিকগুলো ডকুমেনটেশন করা যায় হয়তো মৃত্যু পরবর্তী জীবন, আফটার লাইফ সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে। মিশরের রাজারা সাড়ে চার হাজার বছর আগে যে বিশ্বাসে পিরামিড তৈরি করতেন, সেটা কি সম্পূর্ণ মিথ্যে!"

এই রাফায়েলকে জনি চিনতে পারেন না। পিরামিডে ঢোকার সময় যে রাফায়েলকে জনি দেখেছেন তার সঙ্গে এই রাফায়েলের কোনও মিল নেই। আফটার লাইফ! মৃত্যু পরবর্তী জীবন, এসব কী বলছেন রাফায়েল!

"রাফায়েল তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। চলো ওঠো," জনি রাফায়েলকে হাত ধরে ওঠাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রাফায়েলের মধ্যে যে কী ভীষণ শক্তি ভর করেছে, রাফায়েলকে কিছুতেই তুলতে পারেন না জনি।

নিজের পকেট থেকে পিরামিডের রাস্তার ম্যাপটা বের করে জনির হাতে দেন রাফায়েল। বলেন, "তুমি ফিরে যাও জনি, এই ম্যাপটা কাছে রাখো, এখানে রাস্তা গুলিয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। আর খেয়াল রেখো, পিরামিডের দরজাগুলো কিন্তু সুইভেল ডোর। তুমি যে-কোনও দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেই, সেটা ঘুরে গিয়ে তোমার পিছনের রাস্তাটা ব্লক করে দেবে, তুমি আটকা পড়বে। খুব সাবধান। এই গোলকধাঁধায় একবার ফেঁসে গেলে কেউ তোমায় খুঁজেও পাবে না। ভিতরে এরকম অনেক চোরা দরজা রয়েছে বিভ্রান্ত করার জন্য। আমার জন্য ভেবো না। আমি ফেরার পথ ভালই চিনি। তুমি সাবধানে বাইরে যাও।"

জনির শরীর ধীরে-ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসছে। বুঝতে পারেন, আর বেশিক্ষণ থাকলে আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন। কিন্তু রাফায়েল এরকম করছেন কেন! এতখানি বদলে গেলেন রাফায়েল! তবে কি রাফায়েলকে কোনও অজানা শক্তি এখানে আটকে রেখেছে? একটা অজানা ভয় জনিকে ক্রমশ চেপে ধরে। রাফায়েলের চোখ-মুখ সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। দু'জনে একসঙ্গে এসেছেন, রাফায়েলকে এভাবে ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। কিন্তু তবু যদি এখান থেকে বেরতে পারেন তবে রাফায়েলকে উদ্ধারের কোনও ব্যবস্থা করা যাবে।

সেই পুরনো টানেলের পথ ধরে মাথা নিচু করে ধীরে-ধীরে এগিয়ে যান জনি। একটু এগোতেই আবার সেই হুস হুস শব্দ শুনতে পান জনি। শব্দটা ক্রমশ জোরে হতে থাকে। জোরে হতে-হতে মনে হয় জনির কানটা বোধ হয় ফেটে যাবে। কেউ যেন আবার ওঁর পিছু নিয়েছে। খুব দ্রুত হাঁটার চেষ্টা করেন জনি। পিছনের শব্দটাও যেন তার গতি বাড়িয়ে দেয়। একবার ভাবেন পিছন ফিরে দেখবে কিন্তু সাহস হয় না। মৃত্যু যেন ওঁর সঙ্গে হেঁটে চলেছে।

ছবি: প্রসেনজিৎ নাথ

অনেকের ছবি আঁকতে ভাল লাগে। অনেকের ভাল লাগে গল্প, কবিতা, ছড়া লিখতে। তোমাদের যা ইচ্ছে তা লিখে এবং এঁকে পাঠাও। ভাল হলে এই বিভাগে প্রকাশ করা হবে।

আমার ছবি
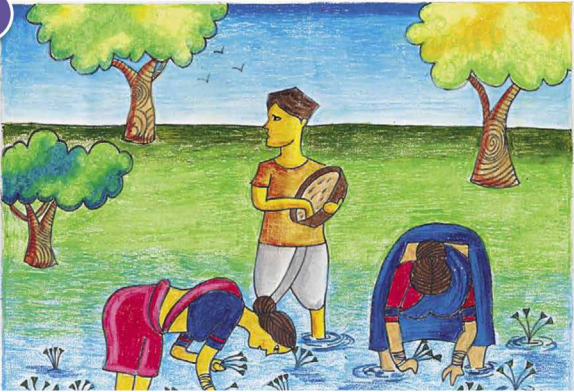
সুপর্ণা নন্দী
অষ্টম শ্রেণি, *পানিহাটি বালিকা বিদ্যালয়, কলকাতা।*

আমার ছবি

দ্যুতি ঘোষ
ষষ্ঠ শ্রেণি, *সাবড়াকোণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, বাঁকুড়া।*

আমার ছড়া

কিরণ্ময় সরকার
সপ্তম শ্রেণি, *চকপাড়া পূর্ব পল্লীসমাজ হাই স্কুল, হাওড়া।*

জড়বস্তুর মধ্যে পড়ে
চেয়ার, টেবিল
সোমনাথদের টিভিতে
নেই আজ কেবিল।
চেয়ার বলে মানুষরা
আমার উপর বসে
খাতা বলে আমার উপর
অঙ্কগুলো কষে।
ব্যাট বলে আমাকে দিয়ে
বলকে মারায় লোকে
আমি ভেঙে গেলে আবার
ফেলে দেবে এক ফাঁকে।
ফুটবল বলে লোকে
আমায় পা দিয়ে মারে
তারা আবার সাজা পায়
যখন তারা হারে।
বালতি বলে আমার মধ্যে
মানুষরা জল রাখে
আমি ফেটে গেলে
আমাকে ফেলেও দেয়
যেখানে ময়লা থাকে।
চটি বলে লোকেরা আমার
উপর চাপ দিয়ে চলে
আমার নোংরা ধোয়
আবার তাদের টিপকলে।
মাটি বলে লোকেরা
আমার থেকে ইট প্রস্তুত
করে।
সেই ইট কাজে লাগায়
সবার ঘরে-ঘরে।

তোমরা যারা দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ো, তারা এই পাতার জন্য লেখা এবং ছবি পাঠাও।

খেজুররস ও পরমার্থ

গৌতম দাশগুপ্ত

আকাশে বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ। বাতাস আরামদায়ক। তবু পরমার্থ পাকড়াশী সন্ধেবেলা মনখারাপ করে বসেছিলেন। আজ তাঁর বন্ধু সদানন্দর বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজো। প্রতিবার নেমন্তন্ন থাকে। এবারও ছিল। কিন্তু আজই সকালে বাজারে স্কোয়াশ ভাল, না পটল ভাল এই নিয়ে তুমুল ঝগড়া করেছেন দু'জনে। তার উপর স্কোয়াশ বলে বাজারে যেটা বিক্রি হয় সেটা নাকি আসলে স্কোয়াশ নয়, জিনিসটার আসল নাম নাকি চোচো, সদানন্দর এই মত। এটা নিয়েও অনেক তর্ক হয়েছে। তাই এখন ও বাড়িতে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যাবে কিনা ভাবছেন পরমার্থ। অথচ

মানুষটা সিন্নি খেতে খুব ভালবাসেন। এদিকে ওবেলা ঝগড়া করে এবেলা সিন্নি খেতে তাঁর মানে লাগছে। এই কষ্টের কথা ভাবতে গিয়ে অন্য কিছু কষ্টও মনে আসছে ভিড় করে। তাঁর ছেলেটা মানুষ হয়নি। লেখাপড়া করে না। খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মেশে। গিন্নি মেজাজি। পরমার্থ তাই খুব সিঁটিয়ে থাকেন সবসময়। একমাত্র অবলম্বন তাঁর একটা বাঁশি। মন ভাল না থাকলে তিনি বাঁশিটা মুখে তুলে নিয়ে ফুঁ দেন। সব কষ্ট ভুলে যান।

বেশ কিছুক্ষণ মনমরা হয়ে বসে থাকার পর ঘরের তাক থেকে বাঁশিটা নিয়ে বেরিয়ে এলেন পরমার্থ। রাস্তা, গাছপালা সব ফটফটে জ্যোৎস্নায় ধুয়ে ঝকঝক করছে। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন কোনদিকে যাবেন। তাঁর বাড়িটা শহরের বাইরের দিকে। ডান দিকে গেলে একেবারে শেষে একটা বিশাল মাঠ। প্রায় তেপান্তরের মাঠের মতো। বাঁ দিকে গেলে একটু-একটু করে শহরের ভিতরে ঢুকে পড়া যায়। তিনি ঠিক করলেন ডান দিকেই যাবেন। একটু ফাঁকায় বসে বাঁশি বাজাবেন। সেদিকেই পা বাড়াতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় অস্পষ্ট শব্দ। থেমে গিয়ে শব্দের উৎসটা বুঝতে চেষ্টা করলেন।

পাশের খোকন বিশ্বাসের বাড়ির দিক থেকেই আওয়াজটা এসেছে বলে মনে হল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে একটু নজর করতেই দেখতে পেলেন একটা ছায়ামূর্তি ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে বেরিয়ে আসছে। পরমার্থ বিড়াল পায়ে এগিয়ে গেলেন। লোকটার উপর জ্যোৎস্না পড়েছে। তাই আড়ালটাকে খুব বেশি কাজে লাগাতে পারছে না লোকটা। পরমার্থ তাই খুব সহজেই লোকটার কাছাকাছি পৌঁছতে পারলেন। চিনতেও পারলেন লোকটাকে। খোট্টু চোর। লোকটাকে পিছন থেকে জাপটে ধরলেন। খোট্টু হাউমাউ করে উঠল, “ওরে বাবারে! ভূত, বেহ্মদত্যি, মামদো। বাঁচাও।”

পরমার্থ খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, “কেমন চোর রে তুই! ধরা পড়বি নাকি চিৎকার করে?”

খোট্টু বেশ লজ্জিত হয়ে বলল, “কে পরিদা নাকি? খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে যা হোক। তা এলেম আছে দাদা তোমার। আমাকে ধরা... এবার চলো তা হলে কোথায় নিয়ে যাবে। থানায়? নাকি গণধোলাই দেবে?”

“ওসব কিছুই না। আমার একটা কাজ তোকে করতে হবে। না করলে তোকে বেঁধে বাজারে নিয়ে গিয়ে গণটিটকিরির ব্যবস্থা করব।”

“গণটিটকিরি? বিষয়টা সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে করছে।”

“বাজার ভর্তি লোকের সামনে তোকে বেঁধে রাখা হবে। ঝানু চোর হয়েও আমার হাতে ধরা পড়েছিস বলে তোকে টিটকিরি, মানে দুয়ো দেবে আর কী!”

“ও বাব্বা! না,না। তার চেয়ে বলো কী করতে হবে।”

“পঞ্চ ঘোষের বাগান থেকে খেজুররস পেড়ে এনে আমাকে খাওয়াতে হবে।”

“তারচেয়ে আমাকে ফাঁসি দাও। জান তো ওই বাগানে তিনটে খুনি কুকুর সারারাত পাহারা দেয়।”

“পারতেই হবে। নইলে গণটিটকিরি। ভেবে দ্যাখ।”

খোট্টু ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, “অগত্যা। জীবনের ঝুঁকি নিতেই হবে। তবে গরিবের উপর এই অত্যাচার, ধম্মে সইবে না কিন্তু দাদা।”

পরমার্থ আপাতত মনে-মনে হেসে নিলেন। খেজুররস খেয়ে তারপর আকাশ ফাটিয়ে হাসবেন বলে ঠিক করলেন। আর ঠিক এই সময় মনে হল তাঁর হাতদুটো জাপটে ধরার ভঙ্গিতে রয়েছে ঠিকই, কিন্তু হাতের বাঁধনে যার থাকার কথা সে নেই। খোট্টু হড়কে গিয়েছে। ডান কানে খোট্টুর গলা শুনতে পেলেন, “আমার রিফ্লেক্সটা একটু কমে গিয়েছে কিনা, তাই অল্প সময়ের জন্য আটকা পড়েছিলাম। চিন্তা কোরো না দাদা। খেজুররস যথাসময়ে পেয়ে যাবে। চলি তা হলে।”

পরমার্থ এবার ডান দিকে পা বাড়ালেন। কিছু দূর এগিয়ে সামনে পড়ল ঘোঁতনবাবুর বাড়ি। ঘোঁতনবাবু কুংফু, ক্যারাটের শিক্ষক। প্রচুর ছাত্র তাঁর। খুব খেপে না গেলে মানুষটাও অমায়িক, সদালাপী। দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন ঘোঁতনবাবুর সঙ্গে একটু সদালাপ করে আসবেন কিনা। এমন সময় বাড়িটার ভিতর থেকে ‘হুঃ, হাঃ, ইয়াঃ’ এরকম সব আওয়াজ আসতে লাগল। আশ্চর্য হলেন পরমার্থ। এত রাতে কারা ক্যারাটে শিখছে? তা ছাড়া বাড়িতে কোনও আলোও জ্বলতে দেখা যাচ্ছে না। কৌতূহলী পরমার্থ লোহার ফটক ঠেলে ঢুকে পড়লেন। পায়ে-পায়ে পিছনের দিকে গিয়ে দেখেন চাঁদের আলোয় ক্যারাটের সাদা পোশাক পরা ডজনখানেক শিক্ষার্থী লাথি, ঘুসি ছুড়ছে। সামারসল্ট খাচ্ছে। তার সঙ্গে ওই শব্দ, ‘হুঃ, হাঃ, ইয়াঃ’। চাঁদের আলোয় ভারী সুন্দর লাগছে দেখতে। ঘোঁতনবাবু ঘুরেফিরে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। একজন ছাত্র পরপর তিনটে সামারসল্ট খেয়ে অনেকটা উঁচুতে উঠে আবার মাটিতে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পরমার্থ হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন, “কেয়াবাত! কেয়াবাত! হাউ অ্যাথলেটিক!”

সবাই চমকে উঠে স্থির হয়ে গেল। একজন হঠাৎই তাঁকে আক্রমণ করে বসল। পরমার্থ সোজা ঘুসি চালিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর ঘুসিটা যেন শুধু লোকটার সাদা পোশাকে লাগল। যেন পোশাকের ভিতর মানুষটা নেই।

সত্যিই তাই। পরমার্থর মুষ্টিবদ্ধ ডান

হাতে ক্যারাটের সাদা পোশাকটা। পোশাকের ভিতরের শরীরটা কোথায় গেল? ঘোঁতনবাবুর গলা শোনা গেল, “এ তুমি কী করলে পরিভায়া? আমার

এই ছাত্ররা ভীষণ লাজুক। তাই তো রাতের অন্ধকারে শিখতে আসে ওরা। ইস, আর কি ওরা আসবে?"

পরমার্থ তাকিয়ে দেখেন লোকগুলো সব উধাও। শুধু পোশাকগুলো পড়ে আছে। বললেন, "কী হল ব্যাপারটা! লোকগুলো গেল কোথায়? ও-ওরা কি তা হলে..."

ঘোঁতনবাবু বললেন, "আমার এরকম ছাত্র আরও অনেক আছে। ভবিষ্যতে তোমাকে আমার ত্রিসীমানায় দেখলে ওদেরকে তোমার পিছনে লেলিয়ে দেব।"

পরমার্থ দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এলেন ঘোঁতনবাবুর বাড়ি থেকে। গলির শেষে যেখানে খোলা মাঠ শুরু হয়েছে, হাঁটতে-হাঁটতে চলে এলেন সেখানে। উন্মুক্ত প্রান্তর যাকে বলে এ হল তাই। মাঝে-মাঝে কারা যেন চাষটাষ করে। তবে এখন একদম ফাঁকা। দুধের মতো জ্যোৎস্নায় মাঠটা অপার্থিব দেখাচ্ছিল। মনের মধ্যে এক অদ্ভুত ভাললাগা নিয়ে মাঠের ধারে পড়ে থাকা একটা বড় পাথরের উপর বসে পড়লেন পরমার্থ। বাঁশিটা বাজাতে ইচ্ছে করছে খুব। এতদিন মন খারাপ থাকলেই বাঁশি বাজাতেন। মন ভাল হয়ে গেলেও যে বাজাতে ইচ্ছে করে, সেটা জানা ছিল না তাঁর। অবশ্য শ্রোতা কেউ নেই। তা কী আর করা যাবে! ওই চাঁদটাকেই শোনানো যাক। বাঁশিটা মুখে তুলে নিয়ে ফুঁ দিলেন। সুরের মূর্ছনায় আকাশ, বাতাস ভাসতে শুরু করল।

কতক্ষণ বাজিয়েছিলেন মনে নেই। শুধু মনের আনন্দে বাজাচ্ছিলেন। কিন্তু একসময় "মহাশয় একটু শুনবেন" ডাকটা কানে গেলেও থামলেন না। একটা স্বর্গীয় অনুভূতির মধ্যে ছিলেন। কিন্তু কেউ যখন কাঁধে ঝাঁকানি দিল তখন চোখ খুলতেই হল। অবাক চোখে দেখলেন তাঁর সামনে ঝলমলে পৌরাণিক ধরনের পোশাক পরা একটা লোক। কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইলেন পরমার্থ। লোকটা তার ঠান্ডা হাতটা পরমার্থর কাঁধ থেকে সরিয়ে নিয়ে বলল, "আপনার সাধনায় বিঘ্ন ঘটানোর জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। দয়া করে শাপ দেবেন না।"

পরমার্থ একটু বিরক্ত হলেন। নিশ্চয়ই আশপাশে কোথাও যাত্রা হচ্ছে। কিন্তু এ লোকটা দলছুট হল কীভাবে? এরকম তো হওয়ার কথা নয়। বিরক্তি গোপন করে বললেন, "কোন অপেরা? কোথায় যাত্রা হচ্ছে?"

"আজ্ঞে," লোকটা একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেল যেন। তারপর সামলে নিয়ে বলল, আজ্ঞে, অধমের নাম চক্রধর। চক্রধর নাগ। আপনাকে নিতে এসেছি। মাত্র ঘণ্টাখানেকের জন্য। অনুগ্রহ করে চলুন। বেশি দূর নয়। ওই বাড়িটার পিছনে।" মাঠের সুদূরতম প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা ইদ্রিসসাহেবের বাড়িটা আঙুল তুলে দেখাল লোকটা।

ইদ্রিসসাহেবকে দেখেছে এমন কোনও মানুষ এ তল্লাটে জীবিত আছে বলে মনে হয় না। শোনা যায় স্বাধীনতারও আগে ইদ্রিসসাহেব সপরিবারে পাড়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তারপর আর কেউ ওবাড়িতে থেকেছে বলে শোনা যায়নি। একসময় রাখালরা গোরু চরাতে গিয়ে নাকি ভয় পেয়েছিল কয়েকবার। এখন তারাও আর যায় না। এই চক্রধর না কী, বলল লোকটা ওখানে নিয়ে যেতে চায় কেন? ভূতটুত নয়তো? ওখানে নিয়ে গিয়ে ঘাড় মটকাবার মতলব আছে নাকি?

লোকটা আবার বলল, "অনুগ্রহ করে তাড়াতাড়ি চলুন। আপনাদের হিসেবে আর সাতান্ন মিনিট ষোলো সেকেন্ড পরে পূর্ণিমা শেষ হয়ে যাবে। আমাদের অনুষ্ঠান তারপর আর করা যাবে না।"

"কী অনুষ্ঠান?"

"ওখানে গিয়েই দেখবেন। চলুন।"

পরমার্থ ইতস্তত করছিলেন। লোকটা আবার বলল, "আপনার কোনও ক্ষতি হবে না, চলুন।"

লোকটা পরমার্থর হাত ধরল। ঠান্ডা বজ্রমুঠি যেন। বাধ্য হয়েই লোকটার সঙ্গে চললেন।

বাড়িটার পিছনে একটা দিঘি আছে শুনেছিলেন। সেটা যে এত সুন্দর কে জানত। কোনও বাজে ঝোপজঙ্গল নেই। অনেক শ্বেতপাথরের মূর্তি চাঁদের রস মেখে ঝলমল করছে। দিঘির ধারে যেন রাজসভাই বসেছে একটা। নানা ধরনের আসনে বিভিন্ন দরের সভাসদ, মন্ত্রীরা বিরাজমান। সবচেয়ে সুন্দর আর উঁচু আসনে যে লোকটা বসে আছেন, তিনি যে রাজার ভূমিকায় অভিনয় করছেন তা বুঝে নিতে অসুবিধে হল না।

নতুন ধরনের যাত্রা, ভাবলেন পরমার্থ। কোনও কৃত্রিম আলো বা মঞ্চ নেই। একমাত্র চাঁদের আলো সম্বল। তবে সবার মুখ ভাল বোঝা যায় না, এই যা অসুবিধে। তা ছাড়া ওই চাঁদের বাতি থাকতে-থাকতে পালা শেষ করতে হবে। তা হোক। এর মধ্যেও এক অসাধারণ রহস্যময়তা আছে, যেটা অনেককেই আকর্ষণ করবে।

চক্রধর, মানে সেই লোকটা যে পরমার্থকে ডেকে এনেছে, রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, "মহারাজ, আমি এই গুণী মানুষটিকে পেয়েছি। আশা করি এঁকে দিয়েই কাজ হবে।"

রাজা পরমার্থর দিকে একবার তাকালেন। তারপর বললেন, "বেশ শুরু করো।"

এত বাদ্যযন্ত্র কোথায় ছিল কে জানে, মৃদঙ্গ, সেতার, এসরাজ, আরও অনেক কিছু একসঙ্গে বেজে উঠল। এতসব বাদক এখানে উপস্থিত, এতক্ষণ বুঝতেই পারেননি পরমার্থ। চক্রধর তাড়া দিল, "কই আপনার বংশীবাদন শুরু করুন।"

পরমার্থ বাজাতে শুরু করলেন। প্রত্যেকে নাচতে লাগল। আশ্চর্য হয়ে পরমার্থ দেখলেন রাজাও নাচছেন।

বেশ কিছুক্ষণ বাজানোর পর থামলেন পরমার্থ। সঙ্গে-সঙ্গে সবাই থেমে গেল। রাজার কপালে ভ্রূকুটি। একজন মন্ত্রী বললেন, "বাদক মহোদয় বোধকরি ক্লান্তি বোধ করছেন?"

ওই মন্ত্রী এক অনুচরকে কী একটা ইশারা করল। অনুচরটি একপাত্র তরল পরমার্থর সামনে ধরল। রাজা গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করলেন, "পান করো।"

আদেশ পালিত হল। এত সুন্দর স্বাদ আর গন্ধযুক্ত ঘন সরবত আগে কখনও পান করেছেন বলে মনে পড়ল না। শরীরে যেন নতুন শক্তি এল। আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তি। জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কী?"

একজন মন্ত্রী বললেন, "রসায়ন। তোমার আগে একজন মাত্র মানুষ পান করেছিল, দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম। সে অবশ্য কয়েক কলসি খেয়েছিল। সে যাই হোক, আবার বাজনা শুরু করো। খুব অল্পসময় বাকি আছে পূর্ণিমা শেষ হতে। শুধু পূর্ণিমা নয়, আজকের এই যোগটা অসাধারণ। আবার একশো বছর পরে এমন যোগ আসবে। সেদিন আবার আমরা নাগেরা মানবরূপ ধারণ করে এখানে জলসা করব। তাই এই সামান্য সময়টুকু আর নষ্ট করতে চাই না। শুরু করো।"

একরাশ বিস্ময় আর কিছুটা অবিশ্বাস নিয়ে পরমার্থ আবার বাঁশিটা ঠোঁটে তুললেন। এবার কোনও ক্লান্তি নেই।

একসময় রাজার গলা শোনা গেল, "আমাদের জলসা সাঙ্গ হল। হে মহান মানব, বর প্রার্থনা করো। বিদায় নেওয়ার আগে তোমার ইচ্ছাপূরণের ব্যবস্থা করব।"

পরমার্থ ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থায় বললেন, "আজ্ঞে, আমি বড়ই দুর্বল। গিন্নিও খুব ঝগড়া করে, ছেলেটার লেখাপড়ায় মন নেই। সারাদিন কেবল খেলা আর খেলা, কথা শোনে না মোটে। আর খোটুর মতো একটা সামান্য চোর পর্যন্ত আমাকে এতটুকু ভয় খায় না।"

রাজা কী বুঝলেন কে জানে, ডানহাতটা তুলে বললেন, "তথাস্তু।"

এবার যা শুরু হল, যেন ভেলকি। ওঁর বিস্ফারিত দুই চোখের সামনে রাজা এবং অন্যরা সবাই একটু-একটু করে রূপান্তরিত হতে শুরু করলেন। এখন তাঁর চারধারে নানা মাপের, নানা রঙের অজস্র সাপ। হিসহিস, ফোঁস-ফোঁস শব্দ। রাজা নিজে এক অতিকায় শঙ্খচূড়, নাকি এঁরই নাম বাসুকি! এবার সবাই দিঘির জলে নেমে গেল। কোন অজানা মন্ত্রের প্রভাবে পরমার্থ ঘুমিয়ে পড়লেন।

"বাবা, বাবা, ও বাবা!" ডাকাডাকিতে ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখলেন ছেলে বদমায়েশি চাহনি নিয়ে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। পিছনে দুই বন্ধু।

"এই খোলা মাঠে বসে এত রাতে বাঁশি বাজাচ্ছ আর ওদিকে সবাই চিন্তায়-চিন্তায় শেষ হয়ে গেল। তোমার কি আর আক্কেল হবে না?"

পরমার্থ অন্য কথা ভাবছিলেন। তিনি চক্রধরের সঙ্গে ইদ্রিসসাহেবের বাড়ির পিছনের দিঘির ধারে গিয়েছিলেন। সেখানে জলসায় বাঁশি বাজিয়েছেন। জলসা শেষে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। অথচ ছেলের ডাকে চোখ মেলে নিজেকে মাঠের ধারের সেই পাথরটার উপর বসা অবস্থায় পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, ছেলে যখন ডাকল, তখনও তিনি বাঁশি বাজাচ্ছেন। এটা কীভাবে সম্ভব! তিনি কি তা হলে স্বপ্ন দেখছিলেন? নাকি ঘুমন্ত পরমার্থকে কেউ ওখানে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছে? বেখেয়ালে বিড়বিড় করে বলে ফেললেন, "আক্কেল গুড়ুম অবস্থায় আক্কেলের কথা বলে আর কী লাভ!"

ছেলে বলল, "কিছু বললে বাবা?"

"অ্যা? না, ও কিছু না। চল, বাড়ি চল।"

ছেলে তার বন্ধুদের সঙ্গে আগে-আগে চলেছে। পরমার্থ একটু পিছনে। হঠাৎ পাশে কেউ ফিসফিস করে উঠল, "দৃশ্যটা আমিও দেখেছি দাদা। ধন্য বাঁশিবাদক তুমি। চিন্তা কোরো না, কাল ভোর-ভোর উঠে পোড়ো। খেজুররসে চান করাব তোমায়।"

পাশে তাকিয়ে খোটুকে আর দেখতে পেলেন না। শুধু দূরে অল্প ধুলো উড়ছে, ধুলো ভরা পথে হালকা গাড়ি চলে গেলে যেমন হয়। পরমার্থ বুঝতে পারলেন ওই ধুলো ওড়ার কারণ খোটুর হরিণদৌড়।

ছবি: রৌদ্র মিত্র

ভারতের প্রথম এবং সবচেয়ে বড় জাদুঘর হল কলকাতার ভারতীয় জাদুঘর।

সেটা ছিল ১৮১৪ সালের কথা। মানে সিপাহী বিদ্রোহ তখন বহু দূরের ঘটনা। ব্রিটিশরা ধীরে-ধীরে গড়ে তুলছে শহর কলকাতাকে। সেই সময় এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যদের মনে হয়েছিল, কলকাতায় একটা জাদুঘরের বড় প্রয়োজন। যেখানে ভারতের নানা জায়গা থেকে পাওয়া বিভিন্ন জিনিস সাজিয়ে রাখা যাবে। ১৮০৮ সালে ভারত সরকার রাজি হল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যদের দেওয়া প্রস্তাবে। চৌরঙ্গি-পার্ক স্ট্রিট এলাকায় জমিও দেওয়া হল ওই জাদুঘর করার জন্য। ডঃ নাথানিয়েল ওয়ালিচ নামে একজন ড্যানিশ বোটানিস্টকে করা হয় জাদুঘরের সম্মানীয় অধ্যক্ষ। আর এভাবেই চালু হয় ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন এবং বড় জাদুঘরটি। এখন অবশ্য জাদুঘর আর আগের জায়গায় নেই। সেই ১৮৭৮ সালেই জওহরলাল নেহরু রোডে ওই জাদুঘর সরিয়ে আনা হয়। আজও জাদুঘরটি সেখানেই রয়েছে।

ভারতীয় জাদুঘর যেন এক বিস্ময়! একদিনে পুরো জাদুঘর ঘুরে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব দেখা প্রায় অসম্ভব। এতটাই তার ব্যাপ্তি। পুরনো ছবি, ভাস্কর্য, মুদ্রা, অস্ত্রশস্ত্র, ফসিল, কী নেই সেখানে। অশোকস্তম্ভ থেকে মিশরীয় মমি, উল্কার টুকরো, এই জাদুঘরে রয়েছে এমন বহু কিছু। ছ'টা বিভাগ রয়েছে এই জাদুঘরে। রয়েছে ৩৫টি গ্যালারি। সেখানেই সাজানো জিনিসগুলো। দেখতে-দেখতে চোখ গোল হয়ে যায়।

কলকাতার যে সব জায়গা অবশ্য দ্রষ্টব্য, তার মধ্যে পড়ে এই ভারতীয় জাদুঘর। এখানে ঢুকে বড়-বড় ফসিল কিংবা হাজার-হাজার বছর আগেকার বুদ্ধমূর্তি শুধু অবাক করে না, ভাবায়ও।

সিজার বাগচী

আমার বন্ধু

বন্ধুর সংখ্যা আমার কম নয়। পাড়ার, স্কুলের, নাচের স্কুলের বন্ধু মিলিয়ে সংখ্যায় অগুন্তি। এদের সকলের সঙ্গেই আমার ভাব। কিন্তু সবাই তো আর প্রিয় বন্ধু হয় না। আমার মতে প্রিয় বন্ধু একজনই হয়। যে সকলের থেকে এগিয়ে। একদম কাছের। যাকে বিশ্বাস করে সব কথা, সবকিছু শেয়ার করা যায়। আমার এইরকমই প্রিয় বন্ধু হল মোমোদিদি। আমার চেয়ে বয়সে ও একটু বড়। কিন্তু তাতে আমাদের বন্ধুত্বে কোনও অসুবিধে হয় না। আমরা যখন একে অপরকে আমাদের নিজেদের গোপন কথা শেয়ার করি, তখন মনে রাখি না আমাদের মধ্যে কে একটু বড় আর কে ছোট। মাঝে-মাঝে আমরা একসঙ্গে বেড়াতে যাই। একসঙ্গে আড্ডা মারি, গল্প করি আবার দু'জনে একসঙ্গে ইংরেজি পড়ি। মোমোদিদি খুশির দিনে যেমন আমার সঙ্গে থাকে, তেমনি দুঃখের দিনেও পাশে থাকে। আমাদের কখনও ঝগড়া হয় না। আমি বিশ্বাস করি সারাজীবন আমাদের এই বন্ধুত্ব অটুট থাকবে।

মধুরিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
সপ্তম শ্রেণি, দমদম মতিঝিল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

একসঙ্গে আড্ডা

বন্ধুর জন্মদিনে

দ্যাখো, ভাবো আর আঁকো

ছবি আঁকতে সবাই ভালবাসে। তাই এবার শুরু হল এই নতুন বিভাগ। এখানে আঁকা অসমাপ্ত ছবিটা শেষ করো দেখি। আঁকা শেষ হলে রং করে ফ্যালো ছবিটাকে।

ছবি: কুনাল বর্মণ

জন্মদিন

তন্ময় ভট্টাচার্য

হলুদ স্কুলবাসটা থামতে না-থামতেই দরজা খুলে লাফিয়ে পড়ল বিতান। আর সঙ্গে-সঙ্গেই মায়ের বকুনি, "কতবার বলেছি দেখে নামতে! এত গাড়ি যাচ্ছে-আসছে, চাপা না পড়লে ভাল্লাগে না নাকি?"

স্টপে দাঁড়িয়ে থাকা অন্যান্য গার্ডিয়ানদের ঠোঁটে চাপা হাসি, সেই হাসি ছড়িয়ে পড়ছে বন্ধুদের মুখেও। এই রোদমাখা বিকেলটা হঠাৎ বড্ড বিস্বাদ লাগল বিতানের, চোখ ফেটে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছে। অন্যান্যদিনের মতো বন্ধুদের 'টাটা' না বলে

মায়ের পিছন-পিছন মাথা নিচু করে ঢুকে গেল গলিতে। অথচ স্কুল থেকে ফেরার সময় মাকে কীভাবে বলবে ঘটনাটা, তা নিয়ে কত প্ল্যানই না করেছে। আজ ম্যাম বিতানের মুখে রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ' আবৃত্তি শুনে ক্লাসের সবার সামনে বলেছেন, "তোমার মতো একটা জুয়েল এই ক্লাসে লুকিয়ে আছে, ভাবতেই পারিনি।" আনন্দে ফুলে উঠতে-উঠতে বিতান আড়চোখে দেখেছিল পলাশ, শ্রেয়া রোহনদের হিংসেয় কুঁচকে-ওঠা ভুরু। এখন মায়ের ভুরুটাও সেরকমই কুঁচকেই আছে, অবশ্য অন্য কারণে। বাড়ি ঢুকে স্কুলের ড্রেস ছেড়ে একেবারে ক্যারাটের পোশাক পরে নিল বিতান। মা রান্নাঘরে, টিফিন গরম করছেন। ঘণ্টাখানেক পরেই বেরতে হবে আবার। বিতান টিভি খুলে বসল। মা চাউমিন দিয়ে পাশেই এসে বসলেন। মুখের রাগী-রাগী ভাবটা এখন অনেকটাই কমেছে। বিতান আমতা-আমতা করে বলল, "জান মা, আজ ম্যাম আমার 'বীরপুরুষ' শুনে খুব ভাল বলেছে।"

"তো? ওইসব মাথা থেকে সরাও। লেখাপড়া করো মন দিয়ে। সারাদিন কবিতা আর গল্পের বই নিয়ে থাকলে লাইফে বড় হতে হবে না। যেমন বাবা তার তেমনই ছেলে!"

বিতান আরও সিঁটিয়ে গেল চাউমিনের ভিতর। চ্যানেল ঘুরিয়ে কার্টুন ধরতে যেতেই মা বললেন, "যাও, কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও গে। ডেকে দেব বেরনোর সময়।"

বেজার মুখে ভিতরের ঘরে চলে গেল সে। বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইল কিছুক্ষণ। ক্যারাটের স্যার আবার দেরি হলেই...

॥ ২ ॥

বেশ কিছুদিন আগে বাবার এক মামা এসেছিলেন বাড়িতে। দশ বছরের ছোট্ট জীবনে বিতান ওই দাদুকে দেখেনি আগে। বাবা অফিসে, মা-ই দরজা খুলে বসিয়েছিলেন ওঁকে। একথা-সেকথার পর ওকে দাদুর পাশে বসিয়ে মা ভিতরের ঘরে চলে গিয়েছিল। দাদু বিতানের মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমার কী করতে ভাল লাগে, দাদুভাই?"

বেশ কিছুক্ষণ হাঁ করে বসে থেকে বিতান জবাব দিয়েছিল, "কেন? স্কুলের লেখাপড়া, গান, আঁকা, ক্যারাটে! জ্বর হয়েছিল বসে সাঁতারটা ছেড়ে দিয়েছি।"

দাদু অবাক হয়েছিলেন, "এই এত কিছু তোমার নিজের ভাল লাগে?"

"হ্যাঁ তো। সোম আর শুক্র সন্ধেয় গান শিখতে যাই, বুধবার আঁকা আর রবিবার ক্যারাটে! মা-ই তো নিয়ে যায় আমায়!"

"খেলতে যাও না মাঠে?"

"হোমওয়ার্ক ভীষণ টাফ যে! খেলতে গেলে ওগুলো করব কখন?" ছেলেবেলা থেকে শুনে আসা মায়ের মুখের কথাগুলোই পাখিপড়ার মতো উগরে দিয়েছিল সে। দাদু বিড়বিড় করে

ইংরেজিতে কী একটা লাইন বলেছিলেন, বিতান বুঝতে পারেনি। যাওয়ার আগে আশীর্বাদ করেছিলেন, "বড় হও, মানুষ হও।"

কথাটা ভাবলে আজও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে বিতানের। আচ্ছা, মানুষ কীভাবে হওয়া যায়? মা তো সেদিন বাবাকে বলছিলেন, "আমার ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ করে তুলবই।" তা হলে কি ক্যারাটে, গান, আঁকা এগুলো শিখলেই মানুষ হওয়া যায়? স্কুলের অনেক বন্ধুই বাড়ি ফিরে মাঠে খেলতে যায়, দাদু-ঠাকুরমার সঙ্গে ছাদে বসে গল্প করে আকাশপাতাল। হঠাৎ ওদের জন্য খুব কষ্ট হল বিতানের। ওরা কোনওদিনই আর মানুষ হতে পারবে না। মা বলে, সময় একবার চলে গেলে আর ফেরে না। লাস্ট এগজ়ামে দুটো সাম ভুল হওয়ায় মা মেরেছিলেন খুব। এগজ়ামের আগেই পিসতুতো দিদির সঙ্গে চিড়িয়াখানা বেড়াতে গিয়েছিল বিতান, তাই ভুল করেছে ম্যাথসে। এবার আর কারও সঙ্গেই কোথাও যাবে না, ঠিক করে রেখেছে সে। রোহন, শ্রেয়া, অনিল

ববিদের থেকে বেশি পেতেই হবে টোটালে। তা হলে মা একটা রিস্টওয়াচ কিনে দেবেন বলেছে। উফ্‌ফ! বিতানের কতদিনের শখ শমীকদাদার মতো রিস্টওয়াচ পরে বাইরে বেরনোর। আর ক্লাস ফাইভে ওঠা মানে তো বড়ই হয়ে

যাওয়া প্রায়! মানুষ হতে গেলে কোন ক্লাস লাগে? জিজ্ঞেস করতে হবে মাকে...

॥ ৩ ॥

সুপুরি গাছের ফাঁকে আটকে থাকা ঘুড়িটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও কোনও লাভ হল না। বিতান ভীষণভাবে চেয়েছিল একটা দমকা হাওয়ায় ঘুড়িটা ছাদে এসে পড়ুক। তারপর ও দিব্যি খেলতে পারবে ওটা নিয়ে। বাড়ি থেকে কেউ ঘুড়ি কিনে দেয়নি ওকে। একবার এগজ়ামের পর বিতান ঘুড়ি

ওড়াতে চেয়েছিল পাড়ার ছেলেদের দেখাদেখি, বাবাকে বলেওছিল শিখিয়ে দিতে। বাবা তখন ভীষণ ব্যস্ত। ওকে ল্যাপটপটা খুলে দিয়ে বলেছিলেন কার রেসিং খেলতে। সেই থেকে আর ঘুড়ি ওড়ানো শেখা হয়নি। ওর স্কুলের বন্ধুরা কেউই পারে না ঘুড়ি ওড়াতে। পিসির বাড়ি গেলে মাঝে-মাঝে ক্যারম খেলা যায় বটে, কিন্তু সে তো বছরে দু'-একবার! বিতানের একদম ইচ্ছে করে না ঘরে বসে-বসে ল্যাপটপে গেম খেলতে। বাড়ির ঠিক পিছনেই ছোট্ট একটা মাঠ, সেখানে তার বয়সি ছেলেরা রোজ ক্রিকেট খেলে বিকেলে। বিতানকে ডেকেছিল তারা দু'-একবার। মা যেতে দেননি। বলেছিলেন, "ছিঃ! ওসব লোয়ার ক্লাস ছেলেদের সঙ্গে মিশে খেললে দু'দিনেই বখে যাবে। ক্যারাটে শিখছ, তাতেই যথেষ্ট এক্সারসাইজ় হচ্ছে। আর দরকার নেই।"

স্কুলের স্পোর্টস টিমেও সিলেক্টেড হয়নি, খেলতে পারে না বলে। রোহন নাকি হাফ সেঞ্চুরি করেছিল। ও ক্রিকেট শেখে কোন একটা আকাদেমিতে। ছোটমাসি একবার প্লাস্টিকের ব্যাট কিনে দিয়েছিল, ওটা নিয়েই তাই ঘরে শ্যাডো প্র্যাকটিস করে বিতান। খুব মন দিয়ে। একদিন কোহলির মতো খেলবেই। রোহনকে দেখিয়ে দেবে, ও নিজেও কিছু কম যায় না।

আস্তে-আস্তে নেমে এল ছাদ থেকে। মা ঘুমোচ্ছে। এখন বড়দিনের ছুটি, তাই রোজ হোমওয়ার্ক করার চাপ কিছুটা কম। সাতটায় সমরেশদা আসবে বেঙ্গলি আর হিস্ট্রি পড়াতে। বিতানের আর-একজন প্রাইভেট টিউটর আছে, সোনালিদি। ম্যাথস আর সায়েন্স পড়ায়। বাবা চেয়েছিলেন বেঙ্গলি আর হিস্ট্রিটা নিজেই পড়াতে। মা রাজি হননি। বিতান শুনেছে বাবা নাকি খুব শার্প স্টুডেন্ট ছিল। স্কুল থেকে ফার্স্ট হয়েছিল হায়ার সেকেন্ডারিতে। মনে আছে ছেলেবেলায় ঘুম থেকে ওঠার আগে বাবা রোজ গালে আর কপালে চুমু খেতেন ওর, টেপরেকর্ডারে চালিয়ে দিতেন সুন্দর একটা গান, 'রাই জাগো গো...' কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলতেন, "দুর্গা দুর্গা..." ছুটির দিনে বারান্দাতেই প্লাস্টিকের ফুটবল নিয়ে খেলতে শুরু করত। এখন সব কেমন জানি বদলে গিয়েছে। আগের মতো আদর করে না, কোলে বসিয়ে শোনান না নেতাজির গল্প। কথার মধ্যে খালি লেখাপড়া আর লেখাপড়া। এই ফোর থেকে ফাইভে ওঠার স্টেজটা নাকি খুব ইম্পর্ট্যান্ট। বিতান 'পাগলা দাশু' খুলে বসল। বাবা কিনে দিয়েছিলেন ক্লাস ওয়ানে। মায়ের তাতেও আপত্তি। এইসব বই পড়লেই নাকি বদবুদ্ধি ঢুকবে মাথায়। আচ্ছা, মা সবসময় এমন করেন কেন? বাবাকে একদিন জিজ্ঞেস করেও ঠিক উত্তর পায়নি। বাবা বলেছিলেন, "বড় হ', নিজেই বুঝবি।"

আবার সেই 'বড় হওয়া'! মাথাটা জোরে ঝাঁকিয়ে বিতান ডুব দিল বইয়ের পাতায়...

॥ ৪ ॥

পলাশ এসেছিল তার মায়ের সঙ্গে। কাকিমা আর মা দু'জনের ভারী বন্ধুত্ব। কিন্তু আড়ালে মা সব সময় পলাশের থেকে বেশি নম্বর পেতে বলে। পলাশ আর বিতান গল্প করছিল সোফায় বসে। হঠাৎ দরজার কাছে এসে মা বললেন, "হ্যাঁ রে, তোরা নিজেদের মধ্যে ইংরেজিতে কথা বলতে পারিস না? এত খরচ করে নামী ইস্কুলে ভর্তি করিয়েছি, গল্প করছিস তা-ও বাংলায়। কেন?

ইংরেজিতে কর!"

কাকিমাও পাশ থেকে হেসে মাথা দোলাচ্ছেন। পলাশ কুঁকড়ে গিয়ে বলে উঠেছিল, "বলি তো! স্কুলে আমরা ইংরেজিতেই কথা বলি। ম্যামেরাও তাই প্রেফার করেন।"

বিতানের কান লজ্জায় লাল। বাবা সব সময় বলেন নিজের মাতৃভাষার থেকে ভাল কোনও ভাষাই হতে পারে না। বাংলা ভাল

> একবার এগজ্যামের পর বিতান ঘুড়ি ওড়াতে চেয়েছিল পাড়ার ছেলেদের দেখাদেখি, বাবাকে বলেওছিল শিখিয়ে দিতে।

করে না শিখে অন্য ভাষায় বিদ্যে ফলায় বোকারাই। এ নিয়ে বাবা আর মায়ের মধ্যে ঝগড়াও হয়েছে অনেক। বাবা পাশে না থাকলে বিতানের তাকভর্তি গল্পের বইগুলো কোথায় হারিয়ে যেত! একদিন রোহন বাড়িতে এসে ওর গল্পের বই দেখে বলেছিল, "শিট! তুই এইসব চিপ আনকালচারড স্টোরি পড়িস! ওয়াক..." রোহন চলে যাওয়ার পরই মা বইগুলো সব ফেলে এসেছিলেন চিলেকোঠার মেঝেয়। রাতে বিতানের কান্না দেখে বাবা প্রায় জোর করেই ওগুলো নামিয়ে আনেন আবার। মায়ের সঙ্গে দু'দিন কথা বলেনি বিতান রাগে। স্কুলেও যায়নি।

পলাশদের সঙ্গেই বেরল বিতানরা। পলাশ এখন শ্রীপল্লির মাঠে ক্রিকেট খেলতে যাবে। আর বিতান আঁকার ক্লাসে। পাড়ার মধ্যেই। মা পৌঁছে দিয়েই চলে আসবেন। বিতানের খুব ইচ্ছে করল হারিয়ে যেতে। বেশ হবে! মা চারদিকে খুঁজে বেড়াবে, কোথাও পাবে না, ভাবতেই একটা চাপা আনন্দে ভরে উঠল বিতানের মন। আঁকার স্যারকে বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল সে। এমন কোথাও লুকোবে, যেখানে মা ভাবতেও পারবেন না। রাস্তায় এলোমেলো হাঁটতে-হাঁটতে বিতান ঢুকে পড়ল মাঠের ওপাশের গলিতে। একেবারে সামনেই রাস্তার বাঁ পাশে একটা ছোট্ট বাড়ি। কবে জানি এসেছে এখানে...খুব চেনা-চেনা লাগছে। গেট খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

রাত্রিবেলা, বাবা যখন ওকে খুঁজে পেয়ে আনন্দে কাঁদছেন, ছেলেবেলার গন্ধ নিতে-নিতে গুটিসুটি নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিল বিতান, ঠাম্মার শাড়ির মধ্যে...

॥ ৫ ॥

বিতানের যখন ছ'বছর বয়স, মা-বাবা এ বাড়িতে চলে এসেছিলেন। কেন, তা আজও জানে না সে। খুব ছেলেবেলায় ঠাম্মার পাশে শুয়ে যখন গল্প শুনত, অথবা স্নানের পর ঠাম্মা যখন লাল চিরুনিটা দিয়ে সিঁথি করে চুল আঁচড়ে দিতেন বিতানের, মায়াময় ভাললাগায় ভেসে যেত সে। রাতে বেশির ভাগ সময়ই ঠাম্মার মশারির নীচেই ঘুমিয়ে পড়ত, মা তখন পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যেতেন পাশের ঘরে। বড্ড ঝাপসা মনে পড়ে সেসব। ঠাম্মার রান্না করা আলুভাজার জন্য কতদিন যে রান্নাঘরের চৌকাঠের উপর বসে থেকেছে হ্যাংলার মতো, তার ইয়ত্তা নেই। তারপর একদিন বিতানের ঘুম ভেঙেছিল মায়ের সঙ্গে ঠাম্মার ঝগড়ার আওয়াজে এবং দিনসাতেক পরেই বিতানরা চলে আসে এই বাড়িতে। এখন বাবার সঙ্গে মাসে দু'-একবার যায় ঠাম্মার কাছে, মায়ের থেকে লুকিয়ে। মা আর কোনওদিন ও বাড়িতে যাবে না বলেছে। অথচ বিতানের খুব ইচ্ছে করে ঠাম্মার পিছন-পিছন তিরতিরিয়ে ঘুরে বেড়াতে ঘরময়, কিংবা কম্বলের নীচে শুয়ে-শুয়ে ময়মনসিংহের গল্প শুনতে। কিন্তু...

সকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। আজ বিতানের জন্মদিন। দশ পেরিয়ে এগারো হবে। কাল রাতে ঠাম্মার কাছ থেকে ফেরার পর থেকেই মা আর কথা বলছেন না ওর সঙ্গে। ঘুম থেকে ওঠার আগেই বাবা বেরিয়ে গিয়েছেন অফিসে। বিতান হাতমুখ ধুয়ে বাইরের ঘরে এল। মা গম্ভীর। টেবিলের উপর ফ্লাওয়ারভাস সাজাচ্ছেন। দুপুরে কয়েকজন বন্ধুর আসার কথা। ইচ্ছে করছে না একফোঁটাও, তবু মাকে গিয়ে প্রণাম করল বিতান। বদলে অন্যদিনের মতো চুমু পেল না। চোখ ভরে আসছে জলে। বিতান বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। বৃষ্টির ছাট এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে ওর প্যান্ট। বাইরে পাঁচিলের ধারে কচু গাছটার পাতায় শব্দ করে জল পড়েই ছিটকে যাচ্ছে চারপাশে। আজ হঠাৎ খুব ভিজতে ইচ্ছে করল বিতানের। কোনওদিন বৃষ্টিতে ভেজেনি সে। একটা টুল এনে তার উপর দাঁড়িয়ে চাবিটা পাড়ল। তালার মধ্যে ঢুকিয়ে ঘোরাতে যাবে, এমন সময় মা টেনে ধরলেন তার হাত। দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল, "কোথায় যাচ্ছ বৃষ্টির মধ্যে? বেশি বাড় বেড়েছে, না? কাল ঠাম্মার কাছে গিয়েছিলে কেন? পিটিয়ে সোজা করে দেব বাঁদরামি করলে। যাও ঘরে গিয়ে বোসো। দিদা আসবে একটু বাদেই। যাও!"

বিতান আজ আর ভয় পেল না। বুকের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত সাহস জড়ো করে গলাটাকে যতটা সম্ভব শক্ত করে বলল, "আমাকে ভিজতে দাও, প্লিজ়।"

টানটা আলগা হয়ে গেল। মা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। গেট খুলে একছুটে উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল সে। মাথার উপর, গায়ের উপর, চোখের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে রাশি-রাশি ভাললাগা। দূরের ওই বট গাছটার দেখাদেখি দু'পাশে হাত বাড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল বিতান। আজ সত্যিই ওর জন্মদিন...

ছবি: মহেশ্বর মণ্ডল

তোমার যে বেস্ট ফ্রেন্ড, তুমি তার বেস্ট ফ্রেন্ড নও

বেস্টফ্রেন্ড কথাটা ঠিক কতটা ভাল, এটা তো অস্মিতাকে দেখেই তুমি বুঝতে পেরেছ। তুমি তো কাউকে বোঝাতেও পারবে না ওকে তুমি কতটা ভালবাসো। বাড়ি থেকে চাউমিন আনো, জন্মদিনে ক্যাডবেরি দাও। টাকা জমিয়ে টেডিবেয়ারও দিয়েছিলে গত বছর! তাতেও কি ও জানতে পারে না, ওর সঙ্গে থাকতে, গল্প করতে তোমার কত ভাল লাগে? কিন্তু তাও কেন নন্দিনীর সঙ্গেই ও দিনরাত হেসে-হেসে কথা বলে? ছুটির সময় তোমার জন্য দাঁড়ালও না কাল?

সমস্যা খুবই গুরুতর। দুঃখে যে তুমি চৌচির হয়ে যাও, কিচ্ছুটি কি অস্মিতা টের পায় না? বোঝে না? এদিকে নন্দিনীকে দেখলেই তোমার দাঁত কড়মড় করে। মাঝে-মাঝে ল্যাং মেরে ফেলে দিতেও ইচ্ছে করে। কিন্তু ভেবেছ কি, তা হলেই অস্মিতা তোমার সঙ্গে কথা বলবে? তুমি ভুলে গিয়েছ যে অস্মিতা প্রেয়ারলাইনে তোমার হাতই ধরে রোজ। আর ওর অঙ্কখাতার পিছনে তুমি দেখেছ বেস্ট ফ্রেন্ড বলে তোমার নামটাই লেখা আছে। তাই মাঝে-মাঝে কারও সঙ্গে ও কথা বললে রাগে ফোঁসফাঁস করলে লোকে তোমাকেই হিংসুটি বলবে। বড় হচ্ছো তো? বড় হলে অনেক কিছু সহ্য করতে হয়। তাই এসব ক্ষেত্রে তোমার রাগ হলেও মনে চেপে রাখতে হবে। কিন্তু যদি এমন হয় তোমার যে বেস্ট ফ্রেন্ড, সে অন্য কাউকে বেস্টফ্রেন্ড ভাবে, তা হলে কিন্তু তোমায় অন্য পথে এগোতেই হবে। নন্দিনী কেন, সৃষ্টিকর্তাকে দোষ দিয়েও লাভ নেই। দুঃখটা বরং মনে না চেপে স্কুলবারান্দা থেকে ফুঁ দিয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দাও। এবার অন্য কারও হাতটা খপ করে চেপে ধরো। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব নতুন করে গেঁথে তোলো। কিছুদিন পরে যদি তুমি দ্যাখো, বেস্ট ফ্রেন্ডের কথা ভাবলেই মনে-মনে ওর নামটাই বারান্দার হাওয়াটা ফেরত দিয়ে যাচ্ছে। ব্যস, তোমার নতুন বেস্ট ফ্রেন্ডের হিল্লে হয়ে গেল।
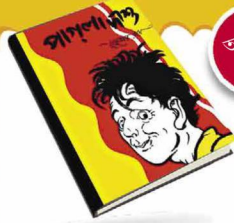
আমার বই

পাগলা দাশু

আসল নাম দাশরথি। পাগলাদাশু নামেই দুনিয়া তাকে দস্তুরমতো চেনে। 'আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "পেন্টেলুন পরেছিস কেন?" দাশু এক গাল হাসিয়া বলিল, "ভালো করে ইংরিজি শিখব বলে।"' সুকুমার রায়ের ননসেন্স দুনিয়ার অদ্বিতীয় প্রতিনিধি। অ্যাদ্দিনে দাশুকে না চিনলে তোমরা কিন্তু ঠকেই গিয়েছ। এমন বিদঘুটে ছেলে বইয়ে রয়েছে, অথচ তার সঙ্গে এতদিন পরিচয় করোনি কেন, ভেবেই ব্রহ্মতালু পর্যন্ত গরম হয়ে উঠতে পারে। প্রথম আলাপে মনে হবে এ ছেলে মস্ত বুদ্ধু আর পাগল। ওইখানটায়ই তো তুমি ঠকলে। লোককে নাস্তানাবুদ করতে সে যে কী ওস্তাদ, তা জগবন্ধু, নবীনচাঁদ থেকে শুরু করে ক্লাসের সক্কলেই টের পেয়েছিল। তুমিও পাবে। বাংলা বইয়ের রাজ্যে ছেলেদের দুষ্টুমির জন্য পুরস্কার ঘোষণা হলে দাশুর নামটা যে সকলের আগে উঠে আসবে, এব্যাপারেও একমত হবে। তবে এরকম সোনায় বাঁধানো মাথা ছাড়াও তার ক'টা ভাল গুণও আছে। নিজের বিটকেল চেহারাখানা নিয়ে অন্যদের ঠাট্টাগুলো হজম করা তো বটেই, নিজেই কত মশকরা করে থাকে। তোমরা যারা একটুও নিন্দে সহ্য করো না, একটুতেই রেগে আগুন হও, তারা দাশুর কাছে গুণটির তালিম নিও। আবার মনে রেখো 'অঙ্ক কষিবার সময়, বিশেষত লম্বা লম্বা গুণভাগের বেলায় তাহার আশ্চর্য মাথা খুলিত।' এদিকে তার দুষ্টুমিতে নাজেহাল হয়ে সকলে তাকে কোণঠাসা করলেই সে এমন আজগুবি কথা বলে, তাকে পাগল মানতে হয়। ব্যস, বেকসুর খালাস পায় সে। বিচিত্র সব খেয়ালের তালে তাল আর আনকোরা সব কাণ্ডে সিরিয়াসনেস ভন্ডুল করার জন্যই যেন তার সৃষ্টি। আমরা যারা সারাজীবন কতই নিয়মমাফিক চলি, তাদের কাছে দাশু যেন না-মেটানো ইচ্ছে, না-পাওয়া মজা দিয়ে তৈরি এক অন্যজগতের মানুষ। প্রাণখোলা হাসি, দুষ্টবুদ্ধি আর জবরদস্ত খ্যাপামি মানেই দাশরথি রায়, এর মতো মজার ছেলে বাংলাসাহিত্য আর একটিও দেখেনি। এমনটা ভাবতে শুরু করলে একটা কথাই পরে খচখচ করবে বলে রাখছি। সেটা হয়েছিল স্বয়ং দাশুর স্রষ্টারও, 'আচ্ছা, দাশু কি সত্যি সত্যি পাগল, না কেবল মিচকেমি করে?'

সুদেষ্ণা ঘোষ

১	২	■	■	৩	৪	৫	■
৬			৭	■	৮		৯
১০		■	১১			■	
■	■	■		■	১২		
১৩		১৪	■	১৫	■	■	■
	■	১৬			■	১৭	১৮
১৯	২০		■	২১			
■	২২			■	■	২৩	
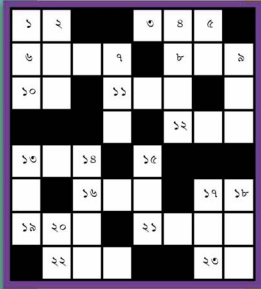
পা শা পা শি

১। একশো।
৩। জালার আকারের মাটির বা ধাতুর আকারের জলপাত্র।
৬। পাখা বা চাকা ঘোরার শব্দ।
৮। কাঠ কাটা হয় যে যন্ত্রে।
১০। কবিতায় 'থাকে'।
১১। বিষ।
১২। গঙ্গাসাগরে যে মুনির আশ্রম আছে।
১৩। আশীর্বাদ।
১৬। কান্না।
১৭। বিস্তীর্ণ জলাভূমি।
১৯। উৎসব।
২১। ভূ-সম্পত্তি।
২২। নৌকো।
২৩। পুরাণের এক দুঃখী রাজা।

উ প র - নী চ

১। ব্যাধ।
২। পুত্র, ছেলে।
৪। লোভে জিভ এমন করে।
৫। খুব দাম্ভিক হলে লোকে ধরাকে ___জ্ঞান করে।
৭। শহর।
৯। কঠিনের পরের অবস্থা।
১৩। মৌখিক কথাবার্তা।
১৪। বড় জলাশয়।
১৫। বনে জাত।
১৭। বাদ্য, বাজনা।
১৮। দস্যি, দুরন্ত।
২০। কাজে নিযুক্ত।

গত সংখ্যার সমাধান

কা	ক	■	■	অ	■	অ	ব
হা	ল	কা	■	প	রা	ধী	ন
নি	র	ত	■	র	সা	ত	ল
■	ব	লা	ই	■	■	■	ক্ষ্মী
শ	■	■	■	স্ব	প	ন	■
র	ম	র	মা	■	র	ত	ন
ব	র	ক	ত	■	জ	না	ব
ত	ম	■	লা	■	■	স	ম

শালুক
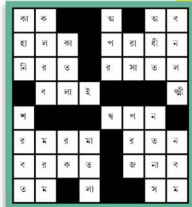
খেলনা টর্চ নিয়ে বেরোও অ্যাডভেঞ্চারে

নিজের হাতে

উপকরণ: ধূপের বাক্স থেকে পাওয়া পিসবোর্ডের চোঙ, একটা গোল প্লাস্টিকের ঢাকনা, মাউন্টবোর্ড, আঠা, হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশির ঢাকনা, অ্যাক্রিলিক রং।

কীভাবে করবে: প্রথমে প্লাস্টিকের ঢাকনাটাকে উপুড় করো। তার উপরে যদি চোঙটাকে খাড়াভাবে জুড়ে দাও, দেখবে গোটা আকৃতিটা একটা টর্চের আকার নিয়েছে। এবার মাপমতো একটা অংশ মাউন্টবোর্ড থেকে কেটে নিয়ে চোঙের খোলাপ্রান্তে আঠার সাহায্যে জুড়ে দাও। এবার ওষুধের শিশির ঢাকনাটা চোঙের মাঝবরাবর এমনভাবে আটকে দাও, যাতে ওটা টর্চের সুইচের মতো মনে হয়। এবার গোটা আকৃতিটা রং করে নিলেই টর্চ রেডি। হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ো অ্যাডভেঞ্চারে!

গুরুপ্রসাদ দে
ফোটো: প্রদীপ আদক

ফারাক পাও
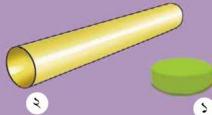
দু'টি ছবিতে অন্তত আটটি অমিল রয়েছে। প্রথমে নিজেরা খুঁজে বের করো। তারপর আগামী সংখ্যায় দেওয়া উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নিও।

ছবি: প্রীতম দাশ
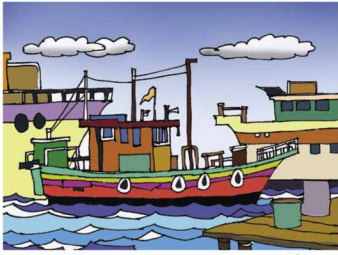
উত্তর : ৫ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়

গত সংখ্যার উত্তর

১) পাহাড়ের গাছটি লম্বা।
২) প্রথম লোকটির হাতের লাঠি ছোট।
৩) প্রথম লোকটির জুলপি ছোট।
৪) ওই লোকটির টুপির রং বদলে গিয়েছে।
৫) পরের লোকটির পিঠে সবুজ ব্যাগে পকেট জুড়েছে।
৬) প্রথম লোকটির ব্যাগের পকেট ছোট।
৭) ডানদিকের মেঘ একটু বদলে গিয়েছে।
৮) প্রথম লোকটির বাঁপায়ের জুতো অন্যরকম।

সুদোকু

৬			৭		৯			৮
		৭				১		
৪				৬				৩
৩				৭				৬
	৮		১		৪		৭	
৯				৫				১
১				৮				৪
		৩				৫		
২			৯		৩			৭

এখানে ৯টি ঘরের একটি বর্গক্ষেত্রে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কিছু সংখ্যা বসানো আছে। ফাঁকা ঘরগুলোয় তোমাদের বাকি সংখ্যা এমন ভাবে বসাতে হবে, যাতে পাশাপাশি এবং উপর-নীচে কোনও লাইনে, এমনকী, ছোট-ছোট বর্গক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কোনও সংখ্যা যেন দু'বার না বসে!

৩	১	৫	৮	৪	৯	৬	৭	২
৭	২	৪	৫	৩	৬	১	৯	৮
৯	৬	৮	২	৭	১	৪	৫	৩
৬	৮	৭	৯	৫	২	৩	১	৪
২	৪	৩	৭	১	৮	৫	৬	৯
৫	৯	১	৪	৬	৩	৮	২	৭
৪	৩	৯	৬	২	৫	৭	৮	১
৮	৭	৬	১	৯	৪	২	৩	৫
১	৫	২	৩	৮	৭	৯	৪	৬

সুদোকুর সমাধান করে ফোটো তুলে পাঠিয়ে দাও এই ইমেল আইডিতে, anandamelamagazine@gmail.com! সঙ্গে লিখবে স্কুল আর ক্লাস।

এখানে ছ'টি প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে এই সংখ্যারই লেখার মধ্যে। বাকি ছ'টি তোমাদের সাধারণজ্ঞানের পরীক্ষা।

1 রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপিয়র, সোফোক্লিস, ব্রেখ্‌ট, কালিদাস। এঁদের মধ্যে মিল কোথায় বলো দেখি?

2 গোপাল ভাঁড়ের গল্প তোমরা সবাই শুনেছ। তিনি ছিলেন রাজ বিদূষক। তাঁরই মতো আরও একজন বিদূষক ছিলেন তেনালি রামন। তিনি কোন রাজার বিদূষক ছিলেন?

8 'পেমাংয়ের শরীর অবশ লাগছিল। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল পরিবেশে যেন বায়ু ফুরিয়ে আসছে।' তারপর কে তাকে রক্ষা করল?

9 "চ্যাম্পিয়ন মানে তো কেবল সব ইভেন্টে মেডেল পাওয়াই নয়। স্পোর্টসম্যান স্পিরিট বলেও একটা কথা আছে।" কথাটা কে বলেছিল এবং কার উদ্দেশে?

10 "জন্মদিনে ক্যাডবেরি দাও। তোমার পকেটমানি জমিয়ে ছোট্ট টেডিবেয়ারও দিয়েছিলে গত বছর।" কাকে দিয়েছিলে এবং কেন?

11 'প্রাণখোলা হাসি, দুষ্টুবুদ্ধি আর জবরদস্ত খ্যাপামি মানেই...' কার নাম মনে পড়ছে? চেন তাকে?

12 আফ্রিকার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণীটির নাম কী বলো তো? যে নিজের ওজনের ৫০ গুণ ওজনের গোবরের তাল গড়িয়ে-গড়িয়ে বহুদূর-দূর জায়গায় নিয়ে যায়।

সুদেষ্ণা বসু

3 আলো ও ধ্বনি সহযোগে ইতিহাসের উন্মোচন করা হয়েছে দিল্লির লালকেল্লা, গ্বালিয়র দুর্গ, সাবরমতী আশ্রম, জওহরলাল নেহরুর তিনমূর্তি ভবনে। বলতে পার কোন বাঙালির নাম জড়িয়ে আছে শেষের তিনটি কাজের সঙ্গে?

4 টেনিসের অনেক সাফল্যই করায়ত্ত এই সুইস তারকার। ১৭টি গ্র্যান্ড স্লাম ট্রোফি। যদিও অলিম্পিক সিঙ্গিলসে সোনা জয় এখনও তাঁর অধরা। কে তিনি?

5 অর্জুন তেন্ডুলকর এক বিখ্যাত বাবার ছেলে। ভারতীয় ক্রিকেটে বাবা-ছেলের সফল হওয়ার এরকম আরও এক নজির আছে। বলতে পারবে তাঁরা কারা?

6 কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কের ভিতরেই জমা থাকে কম্পিউটারের যাবতীয় তথ্য। কবে, কোথায় প্রথম এই হার্ড ডিস্ক তৈরি হয়েছিল?

7 কত সালে ভারতীয় জাদুঘরকে তার আগের জায়গা থেকে সরিয়ে জওহরলাল নেহরু রোডে স্থানান্তরিত করা হয়?

২০ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

১. ত্রিপুরার মহারাজা মহারাজ রাধাকিশোরকে।
২. আমেরিকা। দেশের নাম ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা। ইউ এস। আঙ্কল স্যামের ইনিশিয়াল বা আদ্যাক্ষর বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।
৩. দর্জিপাখি।
৪. বাতাস।
৫. সবুজ।
৬. ১৮৫৪ সালে। এই গাড়ি চলেছিল হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত।
৭. লিট্‌ল অ্যাঞ্জেল্‌স হোম।
৮. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বর্ণপরিচয়।
৯. সবুজবরণ সরকার।
১০. মিঃ উইলসন। ডেনিসকে।
১১. রবি চন্দ্রন অশ্বিন।
১২. ২০ ডিসেম্বর।

সঠিক উত্তরদাতা

বিতান চট্টোপাধ্যায়
সপ্তম শ্রেণি, ডি এ ভি পাবলিক স্কুল, বাঁকুড়া।
অয়ন্তিকা মাইতি
সপ্তম শ্রেণি, হলদিয়া পৌর পাঠভবন।

উত্তর পাঠাও ১৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। আমাদের ঠিকানা 'আনন্দমেলা আমাদের কুইজ়' বিভাগ। ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১

দেড় দিনে একহাজার রান! তা মাত্র ৩২৩ বলে। ১২৯টা চার এবং ৫৯টি ছয় দিয়ে সাজানো ১০০৯ রানের ইনিংসটা থামল ক্যাপ্টেন ডিক্লেয়ার করায়। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মহাসময়কালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কাণ্ড আর কেউ ঘটাতে পারেননি। যা করে দেখাল মুম্বইয়ের 'কেসি গাঁধী স্কুল'-এর বছরপনেরোর কিশোর প্রণব ধনওয়াড়ে।

বাবা প্রশান্ত ধনওয়াড়ে অটো চালান। কষ্ট করছেন ছেলেকে ক্রিকেটার বানাবেন বলে। হঠাৎই এক রূপকথার স্রোতে ভেসে উঠল ছেলে। বিশ্ব ক্রিকেটে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রানের নতুন নায়ক সে! মহারাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের অনূর্ধ্ব-১৬ এইচ টি ভাণ্ডারি কাপ

নিজের রানের পাহাড়ের সামনে প্রণব

হাজারি রূপকথা

এক ইনিংসে হাজার রানে নট আউট থেকে নতুন নজির গড়লেন প্রণব ধনওয়াড়ে। লিখেছেন **জয়দীপ চক্রবর্তী**

ইন্টার স্কুল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফির খেলা চলছিল কল্যাণের ইউনিয়ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড মাঠে। বিপক্ষে 'আর্য গুরুকূল স্কুল'। কেসি গাঁধী স্কুলের ওপেনার প্রণব সারাদিন ব্যাট করে নট আউট থাকল ৬৫২ রানে। বাড়ি ফিরে ন'টার মধ্যে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়াই তার রুটিন। কিন্তু মিডিয়ার দৌলতে ততক্ষণে বিশ্ব জেনে গিয়েছে মুম্বইয়ের এক কিশোরের ব্যাটিং অ্যাডভেঞ্চারের কথা। ছোটদের ক্রিকেট হোক বা স্কুল ক্রিকেট, ১১৭ বছরের পুরনো ইংল্যান্ডের আর্থার কলিন্সের সর্বোচ্চ ৬২৮ নট আউটের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে সে। ফোন, শুভেচ্ছা আর সাক্ষাৎকারের কারণে শুতে-শুতে রাত এগারোটা বেজে গেল। তখন কে জানত যে, নতুন সকাল আরও বড় এক বার্তা বয়ে নিয়ে আসছে! পরের দিন মাঠে নেমে ১০০৯ নট আউট রান করে থামল সে। মাঠ থেকে বেরিয়ে বলল, রেকর্ড করার থেকেও বোলার পেটাতেই তিনি বেশি আনন্দ পান। বিশ্ব জুড়ে রটে গেল প্রণবের ব্যাটিং বিস্ফোরণের বার্তা। শুরু হল সমারোহ, অভিনন্দন, সংবর্ধনা। মহারাষ্ট্র সরকার, মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন প্রণবের জন্য স্কলারশিপের কথা ঘোষণা করেছে। ধোনি, রাহানে থেকে সচিন, বেঙ্গসরকর, লক্ষ্মণের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটাররা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানকে। সব মিলিয়ে ছোট্ট ঘরে প্রণবের জীবনটাই যেন পালটে দিয়েছে ওই হাজারি ইনিংসটা। চোখে তবু সেই পুরনো স্বপ্ন, মুম্বই রঞ্জি দল তারপর দেশের জার্সি গায়ে দেওয়া।

আপাতত ক্লাস টেনের বোর্ডের পরীক্ষার জন্য ব্যাট তুলে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে প্রণবকে। কিন্তু ক্লাব কোচ মোবিন শেখ আর স্কুলের কোচ হরিশ শর্মা দু'জনেই জানেন, বেশিদিন ব্যাট থেকে দূরে রাখা যাবে না এই দামাল কিশোরকে।

এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড গড়লেন প্রণব ধনওয়াড়ে

সেঞ্চুরির পরে ব্যাট হাতে লক্ষ্মী
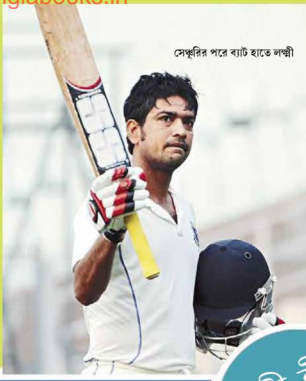
লক্ষ্মী-হীন বাংলা

বর্ষ শুরুর মুখেই হঠাৎ বাংলা ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন লক্ষ্মীরতন শুক্ল। উপযুক্ত বিদায়সম্মান কি পেলেন তিনি? বিশ্লেষণে স্বর্ণাভ দেব

কেরিয়ারের শেষটা যে এভাবে হবে তা সম্ভবত তিনি তো বটেই তাঁর অতি বড় সমালোচকও ভাবেননি। বাংলা ক্রিকেটের অন্যতম মুখ লক্ষ্মীরতন শুক্লকে গত মরসুমেও দেখা গিয়েছে বাংলার হয়ে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব সামলাতে। বাংলাকে রঞ্জি ট্রোফির সেমিফাইনালেও পৌঁছে দিয়েছিলেন তিনি। এবারে মরসুম শুরু হতেই চেনা জায়গাটাই অনেকটা অচেনা হয়ে উঠেছিল লক্ষ্মীর কাছে। তবে সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা খেয়েছিলেন রঞ্জি ট্রোফি চলাকালীন চোট সারিয়ে দলে প্রত্যাবর্তনের সময়ে। অলিখিতভাবে বাদই দেওয়া হয় তাঁকে। তারপরেও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি তাঁর। কিন্তু বছর শেষে আর দাঁত কামড়ে ক্রিজে থাকার মানসিকতা দেখাতে পারেননি তিনি। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় স্টেপ আউট করে সরে দাঁড়ালেন বাংলা ক্রিকেট থেকে। শুরু হল তুমুল বিতর্ক। বিতর্ক তাঁর সরে দাঁড়ানো নিয়ে নয়, সরে দাঁড়ানোর ধরন নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে সর্বত্র। জানা গিয়েছে, কোচ সাইরাজ বাহুতুলে এই প্রবীণ ক্রিকেটারের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলাতেই আচমকা এহেন সিদ্ধান্ত নিলেন লক্ষ্মী। অথচ ছিন্ন করেননি ব্যাট-বলের সঙ্গে সম্পর্ক। এখনও দাপিয়ে মোহনবাগানের হয়ে সি এ বি-র প্রথম ডিভিশনের ক্রিকেট খেলে চলেছেন ৩৫ বছরের এই 'তরুণ'। আজও যেন প্রতিটি সিদ্ধান্তেই একইভাবে চোয়াল চাপা লড়াই। শুরুটা করেছিলেন বছরআঠারো আগে। উইলস ট্রোফিতে দিল্লির বিরুদ্ধে তাঁর মারকাটারি ইনিংস যেন শুরুতেই বলে দিয়েছিল অনেকদিন বঙ্গক্রিকেটের সেবা করতেই তাঁর আবির্ভাব। রঞ্জি, বিজয় হাজারে, সৈয়দ মুস্তাক আলির মতো জাতীয় টুর্নামেন্টে ধারাবাহিকভাবে বঙ্গ ক্রিকেটকে সেবা করেছেন এই অলরাউন্ডার। কখনও ব্যাট হাতে অসাধারণ ইনিংস, কখনও বল হাতে বিপক্ষের উইকেট ছিটকে দিয়েছে তাঁর হাত থেকে বেরনো লাল বল। রঞ্জি ট্রোফিতে বাংলার নিশ্চিত অবনমন রুখে দেওয়ার মায়াবী ইনিংসটাকে তো এখনও বাংলার সর্বকালের অন্যতম সেরা ইনিংসের মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে। কেরিয়ারের শুরুতে দেশের জার্সিতেও বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি। স্বভাবতই তাঁর মতো যোদ্ধার এই ভঙ্গিতে বঙ্গ ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানো বাংলার ক্রিকেটের পক্ষে খুব একটা ভাল বিজ্ঞাপন হল কি?

লক্ষ্মীরতন শুক্ল

ছোট ছোট খেলা
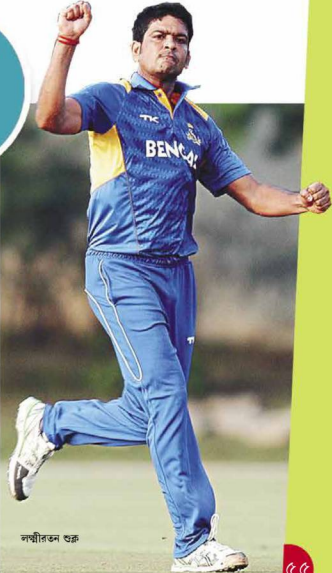
আমাদের রাজ্য থেকে শুরু করে বিশ্বের নানা প্রান্তে ঘটছে খেলাধুলোর নানা ঘটনা। তার ঝলক থাকল এখানে।

মৌমার চোখে অলিম্পিক

বয়স তিরিশ পেরিয়েছে। কিন্তু টেবিলের সামনে তাঁর ছটফটানি দেখলে সে কথা মনেই হয় না। সুরাতে সদ্য কমনওয়েলথ টিটিতে নতুন নজির গড়েছেন মৌমা দাস। এখন তাঁর ভাবনায় রিও অলিম্পিক। কমনওয়েলথ টেবিল টেনিসে ১৪টি পদক জিতেছিলেন এই বাংলারই কিংবদন্তি খেলোয়াড় ইন্দু পুরী। এবার তিনটি রুপো ও একটি ব্রোঞ্জসহ চারটি পদক জিতে ইন্দুর সেই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন মধ্যমগ্রামের মেয়ে মৌমা। ১৯৮২ সালের কমনওয়েলথে চারটি পদক ছিল ইন্দুর। ২০১৩-র কমনওয়েলথে মৌমা জিতেছিলেন চারটি পদক। ২১ বছর ধরে টেবিল টেনিস খেলছেন মৌমা। এবার ফর্মে ফিরে আপাতত অলিম্পিকে নামার প্রস্তুতিতে মগ্ন তিনি।

জিততে চান যুবি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে অস্ট্রেলিয়া সফর করছে ভারতীয় দল। পুরনোদের মধ্যে হরভজন, যুবরাজ আর আশিস নেহরা আবার দলে এসেছেন। তবে নজরে থাকবেন যুবরাজ। অস্ট্রেলিয়ায় তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের জন্য আবার ভারতীয় দলে ফিরেছেন এই বাঁ হাতি অলরাউন্ডার। ঢাকায় ২০১৪ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে শেষবার দেশের হয়ে খেলতে নেমেছিলেন তিনি। কিন্তু ব্যর্থতার জন্য এর মধ্যে আর ভারতীয় দলে ডাক পাননি। এবছর রঞ্জি ও বিজয় হাজারে ট্রোফিতে ভাল পারফরম্যান্স করায় এবছর আবার দলে ফিরে এসেছেন। ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়ী যুবি দলে ফিরে এবার বাইশ গজের লড়াইও জিততে চান।

বিজেন্দ্র এখন আইকন

বছর দুয়েক আগে তাঁর বিরুদ্ধে মাদক নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। অপেশাদার বক্সিং ছেড়ে পেশাদার বক্সিংয়ে পা বাড়ানো ইস্তক তাঁকে কম সমালোচনা শুনতে হয়নি। ভারতের হয়ে অলিম্পিকে প্রথম পদক জয়ী বক্সার সেই বিজেন্দ্র সিংহ এখন দেশের তরুণ বক্সারদের কাছে আইকন হয়ে উঠছেন। ২০০৮ বেজিং অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। ২০১০ এশিয়ান গেমসে সোনা পান। সব ছেড়ে হরিয়ানার ২৯ বছরের এই খেলোয়াড়টি এখন পেশাদার বক্সার। ব্রিটিশ বক্সার সানি উইটিংকে হারানো দিয়ে শুরু। পরপর তিনটি লড়াইয়ে জিতে হ্যাট্রিক। তাই তাঁকে নিয়ে দেশে মাতামাতি শুরু হয়েছে।
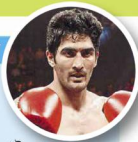
ম্যাকালামের ব্যাট থামছে

বাইশ গজে থেমে যাবে ব্যাট হাতে বোলারদের শাসন করার তাঁর শান্ত, খুনে মেজাজ। সদ্য সমাপ্ত শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট আর ওয়ানডে সিরিজে দলকে জিতিয়েছেন তিনি। এই সিরিজের মাঝেই তাঁর অবসরের কথা ঘোষণা করে দিলেন নিউজ়িল্যান্ডের অধিনায়ক ব্রেন্ডন ম্যাকালাম। ফেব্রুয়ারিতে নিজের দেশে আসন্ন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের পর ব্যাট তুলে রাখবেন তিনি। ওয়েলিংটনে সিরিজের প্রথম টেস্ট ম্যাচটি হবে তাঁর জীবনের শততম টেস্ট। তাঁর নেতৃত্বেই প্রথমবার বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনাল খেলেছে নিউজ়িল্যান্ড। প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে জোড়া শতরান রয়েছে তাঁর। টি-টোয়েন্টিতে সর্বাধিক রানের মালিকও তিনি। অথচ আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দেখা যাবে না তাঁকে।

নজিরের সামনে লিয়েন্ডার

বয়সটা সংখ্যা মাত্র। ফিটনেসটাই আসল। এই মন্ত্রেই ৪২ বছরেও টেনিস কোর্টে দুরন্ত লিয়েন্ডার। ফেলে আসা বছরে চারটি গ্র্যান্ড স্লামের মধ্যে তিনটিতেই মিক্সড ডাবলস চ্যাম্পিয়ন তিনি। কেরিয়ারে ১৭টি গ্র্যান্ড স্লামের মালিক তিনি। ন'টি মিক্সড ডাবলসের সঙ্গে জিতেছেন আটটি ডাবলসের খেতাব। ১৯৯৬ সালে আটলান্টা অলিম্পিকে সিঙ্গলসে ব্রোঞ্জ জিতে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন লিয়েন্ডার। আসন্ন রিও অলিম্পিকে নতুন এক নজির গড়তে চলেছেন লি। আগামী ৬ মার্চ নবম কলকাতা ম্যারাথনের প্রচারের মুখ তিনি। সম্প্রতি সেই প্রচারে কলকাতায় এসেছিলেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "রিওতে আমি পরপর সাতবার অলিম্পিকে খেলতে নামব। যেটা হবে একটা বিশ্ব রেকর্ড।" লি-এর বেড়ে ওঠা এই শহর কলকাতায়। তাই প্রিয় শহর কলকাতায় আগামী দু'-তিন বছরের মধ্যে একটি 'স্পোর্টস একসেলেন্স সেন্টার' গড়ে তোলার ইচ্ছের কথাও তিনি জানিয়েছেন। যেখান থেকে উঠে আসবে আগামী দিনের নতুন-নতুন লিয়েন্ডাররা।

লড়াইয়ে ফিরছেন নাদাল

গত বছরটা ভাল কাটেনি রাফায়েল নাদালের। অস্ট্রেলিয়া ওপেনের পর ফরাসি ওপেনেও কোয়ার্টার ফাইনালে আটকে গিয়েছিলেন। উইম্বলডনে দ্বিতীয় রাউন্ডে হার। আর ইউ এস ওপেনে তৃতীয় রাউন্ডে বিদায় নিতে হয়েছিল ১৪টি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ী এই স্প্যানিশ তারকাকে। চোট-আঘাতের সমস্যা তাঁকে ক্রমেই পিছিয়ে দিয়েছে। এক থেকে র‍্যাঙ্কিং নেমে গিয়েছে পাঁচে। তবে নতুন বছরের শুরুটা করলেন খেতাব জয় দিয়ে। দুবাইয়ে তৃতীয়বার মুদাবলা বিশ্ব টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ জিতছেন। সদ্য শুরু হওয়া অস্ট্রেলিয়া ওপেনে কি আবার তিনি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের স্বাদ পাবেন?
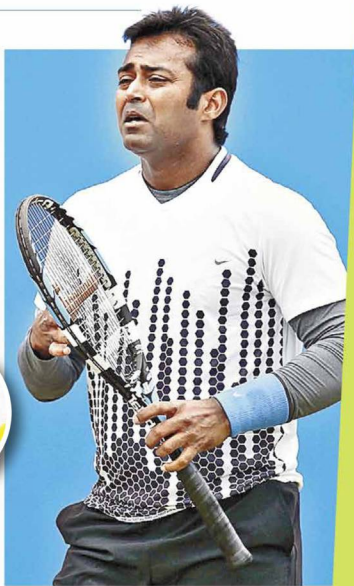
তৈরি হচ্ছেন সুধা

প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। সামনেই এগিয়ে আসছে রিও অলিম্পিক। এর মধ্যেই অলিম্পিকে নামার ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছেন ২০১০ গুয়াংঝউ এশিয়াডে ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজে সোনাজয়ী ভারতীয় অ্যাথলিট সুধা সিংহ। রিও অলিম্পিকে ম্যারাথন দৌড়ে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন তিনি। তাই এখন বাড়ি ছেড়ে উটিতে বেলারুশ কোচ নিকোলাই স্নোসারেভের অধীনে সুধার ট্রেনিং চলছে। দূরপাল্লার দৌড়ে শেষ মুহূর্তে নিজেকে শানিয়ে নিচ্ছেন রেলের এই অ্যাথলিট। সম্প্রতি কলকাতায় 'টাটা স্টিল কলকাতা ২৫কে' দৌড় প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে সুধা জানালেন যে, অলিম্পিকের আগে প্রস্তুতি আর মনোবল বাড়াতে এমন জয় তিনি আরও চান।

চন্দন রুদ্র

১

৩

২

৪

স	র	পুঁ	টি
মা	ক	ড়	সা
দ	স্ত	খ	ত
র	ক্ত	জ	বা

ছবিতে শব্দ খোঁজো

চারটি ছবি দেওয়া আছে। ছবি দেখে সেগুলোর বাংলা নাম পরপর খোপে লিখে ফ্যালো। এবার সেই শব্দগুলোর প্রথম অক্ষর দিয়ে তৈরি হবে একটি বিশেষ শব্দ। চারটি জিনিসের নাম পাশাপাশি বাংলায় লিখে ফ্যালো, যাতে ওই বিশেষ জিনিসটির নাম উপর-নীচ করে পড়া যায়। পেয়েছ খুঁজে?

এবারের সঙ্কেত: কুকুরের গলায় বাঁধা থাকে।

২০ ডিসেম্বর সংখ্যার সমাধান:

স মা দ র

Go Figure

÷ x + −

খোপের নীচে দেওয়া চারটি সংখ্যা যেমন খুশি প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম এবং সপ্তম খোপে বসাও। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের মধ্যে যে-কোনও চিহ্ন বসাও দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ খোপে। যাতে অঙ্কটি কষলে ডান দিকে দেওয়া সংখ্যাটি তার ফল হয়। চারটি সংখ্যা একবারই ব্যবহার করবে। মনে-মনে বন্ধনীও ব্যবহার করতে পার। এই ধাঁধার একাধিক উত্তর হতে পারে।

সহজ

							= ১১

১ ২ ৩ ৮

মাঝামাঝি

							= ১৩

৫ ৭ ৮ ৯

কঠিন

							= ১৯

৩ ৫ ১১ ২৩

২০ ডিসেম্বর সংখ্যার সমাধান:

সহজ: (৯+৩৩)÷২১+৬ = ৮

মাঝামাঝি: (৬×৮)−১০৮÷৩ = ১২

কঠিন: (৭×৮)÷১৪×২৪=৯৬

উপর-নীচ দুটো বিভাগের সঠিক উত্তর পাঠালে তবেই সঠিক উত্তরদাতা হিসেবে তোমাদের নাম উঠবে।

অর্ণব চোংদার, সপ্তম শ্রেণি, বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়, কলকাতা; **জাগরী মুখোপাধ্যায়**, পঞ্চম শ্রেণি, ইন্দা বালিকা বিদ্যালয়, খড়্গপুর; **সম্প্রীতি মুখোপাধ্যায়**, পঞ্চম শ্রেণি, ইন্দা বালিকা বিদ্যালয়, খড়্গপুর।

SALIENCE DESIGN STUDIO